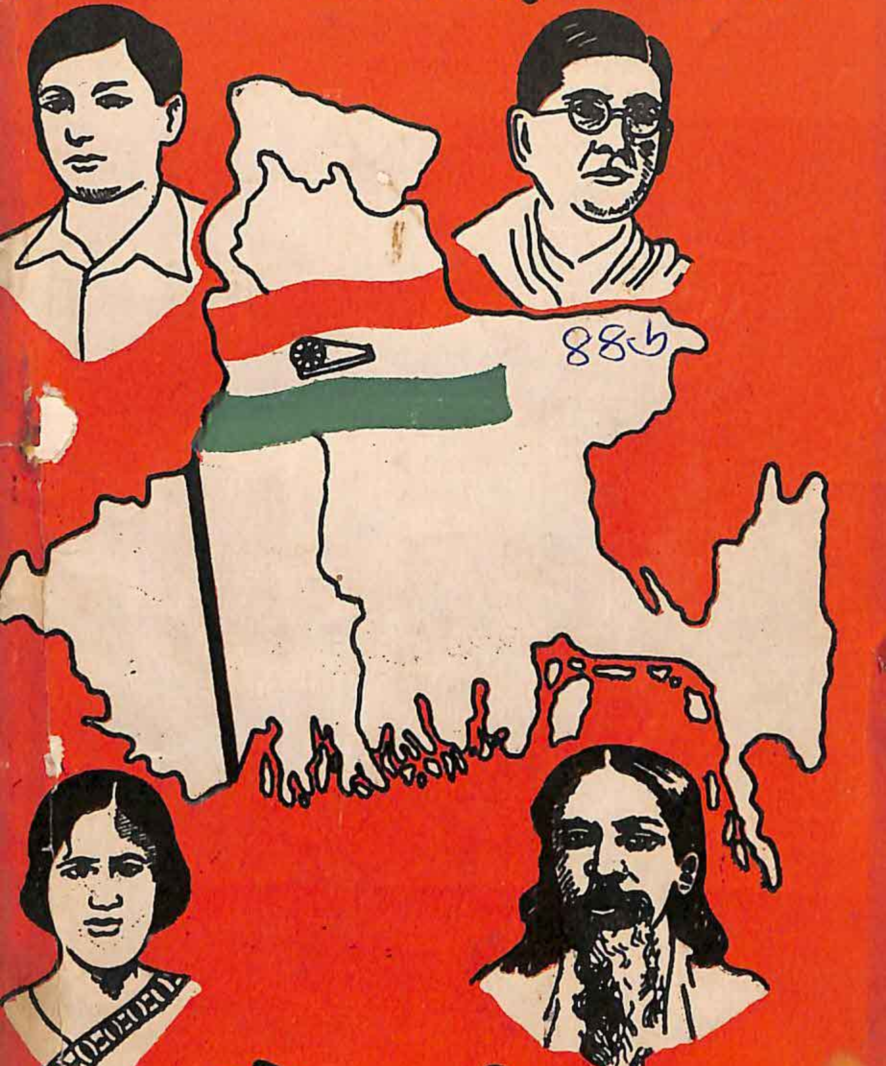
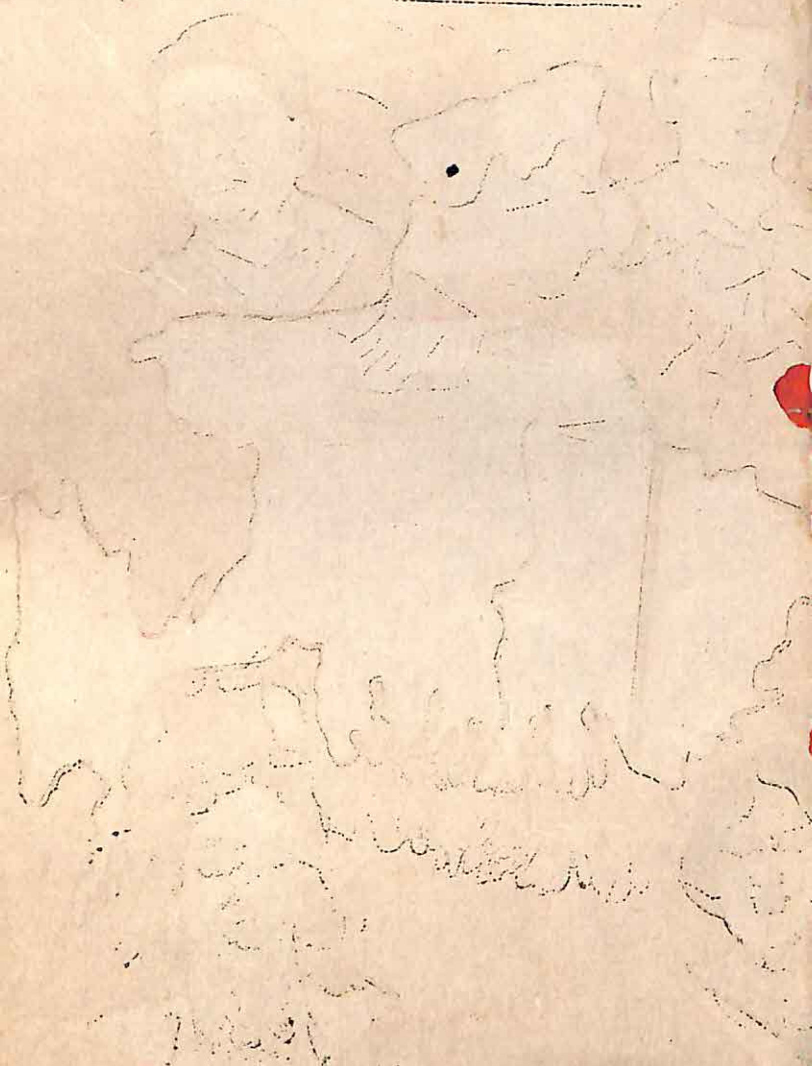
অগ্নি আখরে যাদের নাম



তড়িৎ প্রকাশনী



অগ্নি স্বাক্ষরে যাদের নাম

শ্রীসমীরণ চক্রবর্তী, এম-এ ; বি-টি ; সাহিত্যবিনোদ

তড়িৎ প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
বি, মজুমদার
১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ আট টাকা

মুদ্রণে ঃ
শ্রীমা প্রেস, নবদ্বীপ।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
১। সূর্য সেন	....	....	ক
২। প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার	....	....	ছ
৩। আগষ্ট বিপ্লব	....	....	ঝ
১। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী	....	....	১
২। মহাত্মা রামমোহন	....	....	৬
৩। মহম্মদ মহসীন	....	....	১০
৪। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	....	....	১৩
৫। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর	....	....	১৫
৬। বাঘা যতীন	....	....	২০
৭। বিনয়-বাদল-দীনেশ	....	....	২৩
৮। নেতাজী সুভাষ	....	....	২৬
৯। বিপ্লবী সাধক শ্রীঅরবিন্দ	....	....	৩০
১০। দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ	....	....	৩৪
১১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	....	....	৩৮
১২। বাংলার বাঘ আশুতোষ	....	....	৪২
১৩। শহীদ ক্ষুদিরাম	....	....	৪৭
১৪। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	....	....	৫১
১৫। বিধানচন্দ্র রায়	....	....	৫৫

॥ সূর্য সেন ॥

"জয় নিপীড়িত প্রাণ !
জয় নব অভিযান !
জয় নব উত্থান !

বিপ্লব ও নব-অভিযানের সূর্য সেন, চট্টগ্রাম চট্টলা পল্লীতে তাঁর জন্ম। মধ্যবিত্ত এক বৈদ্য বংশে জন্ম। পিতা রাজমণি সেন। সংসারে আছে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ দু'ভাই ও এক বোন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই, এ পাশ করে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সূর্য সেন চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন বহরমপুর। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এলেন। এখানে এসে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাইস্কুলে অংকের শিক্ষকরূপে কাজ আরম্ভ করেন। অনাড়ম্বর, বিনয়ী, স্বল্পভাষী, শ্যামবর্ণ, খর্বাকৃতি সূর্য সেন অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রদরদীরূপে পরিগণিত হলেন। ধীরে ধীরে "মাষ্টারদা" সম্ভাষণ পেলেন ছাত্রদের কাছ থেকে। স্কুলে তিনি সামান্য মাইনে পেতেন। সংসার কোন রকমে চলে। দু'বেলা ছাত্র পড়াতে হতো তাঁকে। সাংসারিক প্রয়োজনে বিয়ে করেন। কিন্তু সুখে সংসার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ, তাঁর মধ্যে ছিল বিপ্লবের অগ্নিশিখা। শহীদ

বাঘা যতীনের মত তিনিও অচিরেই রাজদ্রোহী হলেন। তিনি ভাবতেন—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়।"

বৃটিশ সরকারের সাথে বাঙালী বিপ্লবীদের সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রতি গৃহে পৌঁছে দিতে হবে। এই পথেই আসবে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্যে বাঘা যতীনের মত সশস্ত্র যুদ্ধে, সম্মুখ সমরে প্রাণ দিতে হবে। এই তো সত্যিকার জীবন। তরুণ মাষ্টারদা দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—

"সংসার-ধর্ম্ম' মিথ্যা, মিথ্যা। মুক্তি চাই—
মুক্তি চাই, মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই।"

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। সেদিন রামনবমীর মেলা। স্বাধীনতা-প্রেমিকদের সভা বসেছে অমৃতসরে, জালিয়ানওয়ালা-বাগ মাঠে। এর প্রবেশ পথ একটি সরু গলি। সেনানায়ক ডায়ার নিরপরাধ জনতার ওপর গুলির আদেশ দিলেন। নর-নারী ও শিশুরা প্রাণ হারাল। সারা পাঞ্জাবে চললো অকথ্য অত্যাচার। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর এলো বাংলায়। ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ। ছাত্রদের বিক্ষোভের সাথে যোগ দিলেন মাষ্টারদা। সবাই প্রতিজ্ঞা করলো মুক্তির লড়াই করবে অস্ত্র হাতে নিয়ে। শাসকবৃন্দ শত্রু।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ। কোলকাতা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কংগ্রেস অধিবেশনে ঠিক হলো সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করতে

হবে। মাষ্টারদাও শিক্ষকতা ছেড়ে নেমে পড়লেন এই অসহযোগ আন্দোলনে।

চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবী সূর্য সেন সেখানকার বিপ্লবীদলকে নতুন করে গঠন করলেন। তৈরী হলো সাম্যাশ্রম। মুক্তিপাগল যুবকের দল যোগ দিল এই আশ্রমে। সারা ভারতে স্থরু হলো বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতি। নায়ক সূর্য সেন। বাংলায় তখন দুই বিপ্লবী দল। একটি 'যুগান্তর' আর একটি 'অনুশীলন'। মাষ্টারদা যুগান্তর দলের নায়ক।

১৯২৩এর ২৩শে ডিসেম্বর। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের পে-ক্লার্ক চলেছেন ঘোড়ার গাড়ীতে। সঙ্গে কর্মচারীদের মাইনে সত্তর হাজার টাকা। নিস্তব্ধ পথে এসে দাঁড়াল মাষ্টারদার লোক অনন্ত সিং, দেবেন দে, উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস। রিভলভার উঁচিয়ে টাকার থলে হস্তগত করে এঁরা চলে গেলেন সোজা সূর্য সেনের গোপন আস্তানায়। সকালে খবর এলো পুলিশ আসছে। বিপ্লবীরা গুপ্তস্থানে পালিয়ে গেলেন।

১৯২৪-২৫ সনের কথা। সূর্য সেন গোপনে বাস করছেন কোলকাতা শোভাবাজারে। ১৯২৫এর ৯ই আগষ্ট রাত্রে ট্রেন থেকে ভ্যানের টাকা লুট হলো। রাত্রির শেষ প্রহরে শোভাবাজার দোতলার ঘরের বারান্দায় হঠাৎ পুলিশের বুটের শব্দ শোনা গেল। ঘরে ছিলেন মাষ্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা। সঙ্গী প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী জানলা ভেঙ্গে মাষ্টারদাকে বের করে দিয়ে দরজা খুললেন। প্রমোদরঞ্জন

বন্দী হলেন। পরে একদিন কোলকাতার পথেই ধরা পড়লেন মাষ্টারদা। আলিপুর, মেদিনীপুর, যারবেদা প্রভৃতি জেলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। বাংলার ও বাংলার বাইরের বিভিন্ন কারাগারে শত শত বিপ্লবী সহ্য করেছেন অকথ্য অত্যাচার। অবশেষে ১৯২৮এ বিপ্লবীদের মুক্তি হলো। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল ফিরলেন দেশে।

কংগ্রেসের নির্দেশে ১৯৩০এ ভারত জুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হলো। শশাঙ্ক চৌধুরী, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি মুক্তিপাগল সাথীদের নিয়ে মাষ্টারদা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরী হচ্ছেন। দিন ঠিক করলেন ১৯৩০এর ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার রাত পৌনে দশটা। যথাসময়ে একখানি মোটরগাড়ী পাহাড়তলীর অক্সিলিয়ারী গেটের ভেতরে এসে ঢুকলো। প্রহরী বললো—"কে ওখানে?" উত্তর এলো —"তোমাদের বন্ধু।" গাড়ী থামতেই ড্রাইভার জীবন ঘোষাল— নেমে সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুক্‌লো, অফিসারের পোষাক পরা লোকনাথ বলকে। প্রহরী ভাবলো—নিশ্চয়ই উপরওয়ালা। ছদ্মবেশে ছিলেন রজত সেন, কালী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী আরো অনেকে। প্রথমেই লোকনাথ বল গুলি করবার হুকুম দিলেন। প্রহরীরা পালিয়ে গেল। আর্মার ভেঙ্গে বিপ্লবীরা প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করলো। পরে অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিলো। সরকারী রিজার্ভ পুলিশদের আক্রমণ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, হিমাংশু সেন, হরিপদ মহাজন ও বিনোদ দত্ত। তাঁরাও সফল হলেন। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন সরকারী অস্ত্রাগারের দিকে, সঙ্গে রইলেন—বিধু ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র চৌধুরী ও সরোজ গুহ, আরো

অনেকে। সরকারী অস্ত্রাগারে তখন ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়ছে। অস্ত্রাগারের এক অংশে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিতে গিয়ে তাদের সাথী হিমাংশুর দেহে আগুন লেগে গেল। অনন্ত সিং তাঁকে মোটরে করে নিয়ে গেলেন শহরের নিরাপদ স্থানে চিকিৎসার জন্যে। সঙ্গে গেলেন গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল। সূর্য সেন হতবাক্। যোগ্য কর্মীর অভাবে পরবর্তী কাজে হাত না দিয়ে আত্মগোপন করার কথা স্থির হলো। এদিকে হিমাংশুকে যারা রাখতে গেল তারাও ফিরে এলো না। সদলবলে অনাহারে, অনিদ্রায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মাষ্টারদা।

১৯৩০ এর ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম সহর থেকে তিন মাইল দূরে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের সাক্ষাৎ হলো। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। ব্রিটিশ ফৌজ পেছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। সূর্য সেন বিপ্লবীদের পাহাড় ছেড়ে লোকালয়ে যেতে আদেশ দিলেন। এদিকে হিমাংশু সেনের মৃত্যু হলো। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং ফেনী ষ্টেশনে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোলকাতায় চলে যান। সূর্য সেন গুপ্তভাবে বাস করতে লাগলেন। ইংরেজ গুপ্তচর তাঁকে কিছুতেই ধরতে না পেরে পুরস্কার ঘোষণা করলো দশহাজার টাকা। প্রায় তিন বছর কেউ তাঁর সন্ধান পান নি। অবশেষে নেত্র সেন নামে এক বিশ্বাসঘাতকের ঘৃণ্য চক্রান্তে মাষ্টারদা ধরা পড়েন। । ১৯৩৪এর ১২ই জানুয়ারী রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিটে মাষ্টারদার ফাঁসী হলো। তিনি ফাঁসীর মঞ্চেই জয়গান

গেয়ে গেলেন। মাষ্টারদার সেই অমর আত্মার বাণী আজো আমরা শুনি—

"আমরা দাঁড়াবো উঠি, আমরা
ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।"

অনুশীলনী

১। সূর্য সেনের কয়েকজন সাথীর নাম কর।
২। মাষ্টারদার নির্ভীক জীবনের পরিচয় দাও।

প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার

অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা। বাংলার নারী-শহীদ প্রীতিলতার বাবার নাম জগবন্ধু ওয়েদ্দেদার। তিনি চট্টগ্রাম পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন।

প্রীতিলতা জগবন্ধুবাবুর বড় মেয়ে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মানুষ। সাজগোজের কোন বালাই নেই। বাবামায়ের আশা বড় হয়ে বাপমায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। প্রীতির সরল ব্যবহারে সকলে ভাল বাসতো। এই মেয়েই যে একদিন অগ্নিকন্যা হবে কে তা জানতো।

চট্টগ্রাম থেকে প্রীতি প্রবেশিকা পাশ করে। তারপর ভর্তি হয় ঢাকার ইডেন কলেজে। এখানে তার দৃষ্টি বদলাতে লাগলো। চট্টগ্রামে মাষ্টারদার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে চারিদিকে তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। দেশের ছেলে-মেয়েদের গড়ে তোলার জন্য বহু সংঘ-সমিতি তৈরী হয়েছে। ঢাকায় দীপালি সংঘে ভর্তি হল সে। শিখতে লাগল লাঠি ছোরা খেলা। সংগঠনের কাজও অনেক শিখলো সে।

আই, এ পাশ করে কলকাতার বেথুন কলেজে বি, এ ক্লাসে ভর্তি হল। মায়ের চিঠি পেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে চট্টগ্রামে এল। শিক্ষয়িত্রীর চাকুরী নিল সে। শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে করতে বি, এ পাশ করল।

সংগ্রামের জন্য গোপনে প্রস্তুতি চলছে। এই সময় প্রীতি বন্দুক ছুঁড়তে শিখে নিল। তখন মাষ্টারদা থাকতেন গুপ্ত ঘাঁটিতে। প্রীতি একদিন মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে যান। এদিকে পুলিশ ঘাঁটিটাকে

ঘিরে ফেলল। পালাবার উপায় নাই দেখে গুলি চালাতে লাগল। প্রীতি মাত্র কয়েক দিন আগে গুলি চালাতে শিখেছে। বেশ কিছুক্ষণ দুই পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হল। প্রীতিও গুলি চালাল, অবস্থা খারাপ দেখে মাষ্টারদা প্রীতিকে সরিয়ে দেন। লুকিয়ে বসে থেকে জীবন কাটাতে সে চাইল না। প্রীতি আত্মবিসর্জন দিয়েও কাজ সমাধা করে আসবে। ভয় কাকে বলে সে জানে না।

প্রীতির ওপর ভার পড়ল ইউরোপীয়ান ক্লাব ধ্বংস করার। ক্লাবের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মহিলাদের তখন নাচ, গান, হাসি, খেলা চলছে। হঠাৎ আক্রমণে সবাই দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি আর চীৎকার শুরু করে দিল। বিপ্লবীদের অস্ত্রগুলি যেন মুখর হয়ে উঠছে। ক্লাবের কাছেই ছিল সৈনিকদের ঘাঁটি। গুলির আওয়াজে তারা ছুটে এলো। বিপ্লবীদল ততক্ষণে পাহাড় বেয়ে নেমে গেছে চোখের আড়ালে।

প্রীতি পুরুষের বেশে এসেছিল। সে সবার পিছনে পড়ল। সৈনিকদের বোমের এক টুকরা এসে বিঁধলো প্রীতির বুকে। রক্ত ক্ষয় হতে লাগলো প্রচুর। অবসন্ন হয়ে পড়ল প্রীতি। পুলিশের হাতে পড়ার ভয়ে পটাশিয়াম সায়োনাইড খেয়ে মৃত্যু বরণ করলো। বিপ্লবে, আন্দোলনে আর আত্মদানে সে কখনও পিছপাও হয় নাই।

অনুশীলনী

১। প্রীতির প্রথম জীবন কেমন?

২। সে কতদূর লেখাপড়া শিখেছিল?

৩। সে বিপ্লবের কোন্ কোন্ অভিযানে নেত্রীত্ব করেছে?

আগষ্ট বিপ্লব

"ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর,
মরিবার মুখে মরণের বাণী উঠিতেছে মার মার্!"

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে বাংলার নেতৃত্ব অবিস্মরণীয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়-সংগ্রাম যে শক্তি অর্জন করেছিল, স্বাধীন ভারতে আজ আমরা তারই সুফল ভোগ করছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের বিকশিত আদর্শ মূর্তিময় হয়ে উঠেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনের বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ অভিযানে। ভারতের বাইরে থেকে নেতাজীর সশস্ত্র অভিযান, আর দেশের অভ্যন্তরে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" আন্দোলন—এই দুই মহাশক্তির সম্মুখীন হয়েই ইংরেজ এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

"ইংরেজ, ভারত ছাড়"—এই আন্দোলন যে কোন্ পথে চল্‌বে, সে কথা বলার সুযোগ পেলেন না গান্ধীজী। তার আগেই কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সাথে গান্ধীজীও বন্দী হলেন ইংরেজ সরকারের হাতে। জেলে যাবার আগে শুধু বলে গেলেন গান্ধীজী, এই আন্দোলনের নেতা ও নীতি ঠিক করে নিতে হবে সাধারণ মানুষকে নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে। আন্দোলন আরম্ভ হলো ১৯৪২-এর ৯ই আগষ্ট। এরই নাম—"আগষ্ট বিপ্লব!"

নিখিল ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হলো গান্ধী বাণী—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।" হয় স্বাধীনতা অর্জন করব—না হয় সে চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ দেব। কোন নেতা নেই—কোন নির্দেশ নেই—জনতার আন্দোলন আরম্ভ হলো রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। বাংলা তথা সমগ্র ভারতে বিপ্লবের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়লো। "ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা শঙ্কা নাহিক আর।" মেদিনীপুর জেলায় তা প্রবল আকার ধারণ করলো। থানা, ডাকঘর, আদালত সব দখল করে নিল বিপ্লবীরা। ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন নেতাজী। আর মেদিনীপুরের বুকেই গঠিত হলো স্বাধীন জাতীয় সরকার। এই জাতীয় সরকার গঠনের সময় বিপ্লবীরা অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। বিপ্লবীরা খালি হাতে এগিয়ে চলেছেন। সামনে পুলিশ ও সৈন্যদল বন্দুক হাতে নিয়ে। একজন বিপ্লবী শত্রুর গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ছেন আর তাঁর শূন্যস্থান তৎক্ষণাৎ পূরণ করছেন আর একজন বিপ্লবী। মরণপাগল বিপ্লবীদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়েছে। তবুও বিপ্লব থামে নি। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়লো মেদিনী-পুর জেলায়।

বিপ্লবীদল মেদিনীপুর শহরের থানা দখল করতে চলেছে। সরকারী সৈন্যদল শহরের প্রবেশ পথে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে। বিপ্লবীদের দেখে তারা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। মুক্তি-পাগল বিপ্লবীদের একমাত্র সহায় তাঁদের জাতীয় পতাকা। বুকে তাঁদের অদম্য সাহস—মুখে তাঁদের সংকল্প বাক্য—"করেঙ্গে ইয়ে

মরেঙ্গে।” গুলির আঘাতে যিনি যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, তিনি তাঁর জাতীয় পতাকা পেছনের বিপ্লবী ভাই-এর হাতে দিয়ে যান। প্রাণ দিয়ে তাঁরা জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এমনি করে বিপ্লবী রামচন্দ্র বেরা হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে থানার দুয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ তিনি গুলি বিদ্ধ হলেন। রামচন্দ্র মরে গেছেন ভেবে শত্রুসৈন্য তাঁকে টেনে নিয়ে থানার মাঠে ফেলে দিলো। রামচন্দ্র কিন্তু তখনও জীবিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি চেতনা ফিরে পেলেন। দেখলেন তাঁরই দেহের রক্তে থানার মাঠ হয়েছে রঞ্জিত। বিপ্লবী—বীরের আনন্দ আর ধরে না। চিৎকার করে বলে উঠলেন—“থানায় পৌঁছে গেছি।” যেই দাঁড়িয়েছেন অমনি আর একটা গুলি এসে বক্ষ বিদ্ধ করে চলে গেল। বিপ্লবী রামচন্দ্র এইবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মেদিনীপুর শহরের দিকে আসছে আর এক নারীবাহিনী। পুরোভাগে এক বৃদ্ধা মহিলা। নাম তাঁর মাতঙ্গিনী হাজরা। বয়স তিয়াত্তর। তাঁদের দেখে শত্রুসৈন্যের বন্দুক গর্জে উঠলো। ডাইনে বাঁয়ে সঙ্গিনীরা লুটিয়ে পড়লো পথের ধূলায়। মাতঙ্গিনী কোন দিকে লক্ষ্য না করে এগিয়ে চললেন জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে। মুহূর্তে গুলি বিদ্ধ হলেন তিনি। তবু বজ্রমুষ্টিতে পতাকা নিয়ে চললেন বীর রমণী। এইবার আর একটি গুলি এসে পড়লো তাঁর বুকে। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী লুটিয়ে পড়লেন ধূলায়। মুমূর্ষু মাতঙ্গিনী বলে গেলেন—“বন্দেমাতরম্।”

স্বাধীনতার এই বীজমন্ত্র দেশের শত শত নরনারীকে পাগল করেছিল সেদিন। তাই তাঁদের “জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত

ভাবনা হীন।" আগষ্ট বিপ্লবের অমর শহীদদের আত্মার শাশ্বতী বাণী আজো যেন আমরা শুনি—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই,
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই,
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।"

অনুশীলনী

১। আগষ্ট বিপ্লব কখন হয়েছিল ?

২। আগষ্ট বিপ্লবে বিপ্লবীদের সাহসিকতার পরিচয় দাও।



বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী ॥

সুদীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ-জননী ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এর পশ্চাতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের জীবনদান। তাঁহাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই স্বাধীনতা। দেশজননীর পরাধীনতা, সেইসব মুক্তিপাগল মানুষকে উন্মাদ করে তুলেছিল। সেইসব জানা-অজানা দেশ-প্রেমিককে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। জাতির জীবনে তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ভারতে স্বাধনীতার আন্দোলন বাংলাদেশেই প্রথম আরম্ভ হয়। বাংলাই সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ে রাজা রামমোহন রায়ের কথা। বর্তমান ভারতের জন্মদাতা রামমোহন। তিনিই প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বিদেশী শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। রামমোহনের নেতৃত্বেই আমাদের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন সার্থক হয়েছিল। এই পথে দেশে যাঁরা আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের দাবিকে তিনি ভাষা দিয়াছেন। তিনি 'ভারত-সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি বাগ্মী ও লেখক ছিলেন। এর পরেই হলো কংগ্রেসের জন্ম। এর প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই শহরে। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। প্রায় সেই সময়েই বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দ-মঠ' প্রকাশিত হয়। বংকিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সমগ্র ভারতের

নরনারীকে জাগিয়েছে নব শক্তিতে। ১৯০২ সালে বাংলাদেশে 'শিবাজী-পূজার' যে প্রবর্তন হয় তাতে বাঙালী ও মারাঠার মিলন ঘটে অন্তরে অন্তরে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতা অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট সমগ্র বাঙালী জাতি বংগভংগ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। 'রাখী বন্ধনের' ধুম পড়ে যায় বাংলার ঘরে ঘরে। বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গান—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"

বাঙালীর বিপ্লব-সাধনা বড় দুঃখের সাধনা। বিপ্লবযুগের প্রথম বলি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অনশনব্রতী যতীন দাস মৃত্যুবরণ করেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রাণ হারান বাঘা যতীন। স্বদেশী আন্দোলনে মনীষী বিপিন চন্দ্র পাল আর ঋষি অরবিন্দের অবদান কখনো ভুলবার নয়। বিপিনচন্দ্রের সিংহনাদে ব্রিটিশ-সিংহও ভীত হয়েছিল। ঋষি অরবিন্দ বললেন—"স্বদেশ প্রেমই পরাধীন জাতির একমাত্র ধর্ম।"

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী পথপ্রদর্শক। তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সংগ্রামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ এর "ভারত ছাড়" আন্দোলনে বাঙালীরা বিশেষভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশজননীর সেবার জন্য সবকিছু ছেড়ে চিত্তরঞ্জন এগিয়ে এলেন।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম যে শক্তি অর্জন করেছিল, স্বাধীন ভারতে আজ আমরা তারই সুফল ভোগ করছি। বাংলার লালমোহন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকা মজুমদার, রমেশ চন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি বরেণ্য নেতৃবর্গ যেভাবে জাতীয় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের আদর্শ মূর্তিময় হয়ে উঠেছিল তার পরবর্তী জীবনের বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ অভিযানে। ছদ্মবেশে ভারতের সীমান্ত পার হলেন সুভাষ। ভারতের বাইরে গড়ে তুললেন "আজাদ হিন্দ ফৌজ।" মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্ম প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ করেন। "দিল্লী চলো"—এই ছিল তাঁর সংকল্প। একদিকে নেতাজীর অভিযান, অন্যদিকে মহাত্মাজীর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন—এই দুই মহাশক্তি ইংরেজকে পরাভূত করে। দিল্লীর লালকেল্লায় আবার স্বাধীনতা-সূর্য উদিত হলো। ভারতের মুক্তি-আন্দোলন বাংলাদেশেই আরম্ভ হয়েছিল। এর শেষ অধ্যায়ও রচনা করলেন একজন বাঙালী। এমনি করে দেখা দিল ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্টের নবপ্রভাত। স্বাধীন বাংলা—স্বাধীন ভারত। স্বাধীন বাংলায় গঠনের কাজ চলে দুর্বার গতিতে। গৌরব ও উন্নতির পথ ধীরে ধীরে প্রশস্ত হলো। ১৯৪৮এ নব্যবাংলার স্রষ্টা কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস সদস্যরূপে পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী হন। পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর অনলস কর্মপ্রচেষ্টা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি পশ্চিমবংগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে

পশ্চিমবংগ গ্রামোন্নতির পথে যতখানি এগিয়েছে তার মূলে রয়েছে বিধানচন্দ্রের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা।

"জানি, পথ দুর্গম,
জানি, পথ বন্ধুর—
দেখি, যদি দেখা পাই
সিন্ধুর।"

অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার দানের কথা সংক্ষেপে লিখ।

২। রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি" গানটি লিখ।

॥ মহাত্মা রামমোহন ॥



'বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের
বৈজয়ন্ত হার,
নমস্কার ! করি নমস্কার !"

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই মে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকান্ত রায়। রামমোহনের চোখে মুখে ছিল অসাধারণ দীপ্তি। তিনি সত্যসন্ধানী ও চির

নির্ভীক। রামমোহন যাতে লেখাপড়ায় ভাল হতে পারে পিতা রামকান্ত তার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি প্রথমে বাংলা ও ফার্সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। আট বৎসরের মধ্যেই এ ছুটো ভাষা তিনি ভালো করে শিখে ফেলেন। তারপর আরবী ভাষা শিখবার জন্য যান পাটনায়। তিন বছরেই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। রামমোহন সংস্কৃত ভাষা ও নানা শাস্ত্র শিখবার জন্য গেলেন বারাণসীতে। সেখানে তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে রামমোহন সংস্কৃত পাঠ শেষ করে গৃহে ফেরেন। উপনিষদ পড়তে পড়তে তাঁর ধারণা হলো মূর্তি পূজার প্রয়োজন নেই। রামমোহনের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব জেনে পিতা রামকান্ত তাঁকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেন। গৃহত্যাগী রামমোহন নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গেলেন তিব্বতে। ওখানে গিয়ে হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকেন এবং প্রবল আন্দোলনও চালালেন। তিব্বতে একদল লোক তাঁর কথা শুনে ক্ষেপে গেল। তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা চালালো। এক দয়ালু রমণীর চেষ্টায় তাঁর জীবন রক্ষা পায়। রামমোহনের কষ্টের কথা শুনে পিতা রামকান্ত তাঁকে ফিরিয়ে আনেন গৃহে। ফিরে এসে রামমোহন হয়ত তাঁর মত পরিবর্তন করবেন—পিতার এই ধারণা ছিল। কিন্তু তা হলো না। রামমোহন প্রবলভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। আবার তিনি গৃহ হতে বিতাড়িত হলেন। এই সময়ে রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয়। পিতার সম্পত্তি পাবার কোন যোগ্যতা নেই বিধর্মী রামমোহনের। মামলা চললো হাইকোর্টে। মা দাঁড়ালেন

ছেলের বিরুদ্ধে। জয়ী হলেন রামমোহন। কিন্তু সম্পত্তি না নিয়ে রামমোহন সমস্তই মাকে দিয়ে দিলেন। রামমোহনের এই মহত্ত্ব দেখে মায়ের চোখে এল জল। মা পরাজিত হলেন পুত্রের মহত্ত্বের কাছে।

তারপর সুপণ্ডিত ও তেজস্বী রামমোহন সরকারী চাকুরী পেয়ে রংপুরে চলে গেলেন। দীর্ঘ ১৩ বৎসর সুনামের সঙ্গে চাকুরী করে দেশে ফিরে এলেন। দেশের কুসংস্কার দূর করবার জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার শুরু করে। দলে দলে লোক খ্রীষ্টান হতে লাগলো। রামমোহন উদ্বিগ্ন হলেন। ভাবলেন এই ধর্মত্যাগের হিড়িক বন্ধ করতেই হবে।

শেষে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করলেন। এর মধ্যে হিন্দুত্ব ছিল অনেকখানি। বেদের উপর নির্ভর করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করলেন সাধারণ মানুষের মাঝে। এক ব্রহ্ম বা অদ্বৈত ঈশ্বরের উপাসনাই এই ধর্মের মূল তত্ত্ব। অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। এই ধর্মের প্রসার পরবর্তীকালে খুব বেশী হয়নি। তবে সেই সময়ে দলে দলে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের পথ রামমোহন বন্ধ করেছিলেন।

রামমোহন ছিলেন সমাজসংস্কারক। তিনি এদেশে 'সতীদাহ' প্রথা নিবারণ করেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তখন গভর্ণর ছিলেন বেন্টিংক। রামমোহন তাঁর সাহায্যে সতীদাহ প্রথা চিরতরে রহিত করেন। রামমোহন বাংলা গদ্যকে বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। তাঁর গদ্য রচনা প্রাঞ্জল ও

সাহিত্যরসে পূর্ণ। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন-উপনিষদ, ব্যাকরণ ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'ব্রহ্মোপাসনা' 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষে উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে রামমোহনের প্রয়াস ভুলবার নয়। রামমোহনের রচনায় ভগবৎ প্রেমের পরিচয় আছে। "হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্ব নিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণ জানি এমত অনুগ্রহ কর।" ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর তাঁকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। আকবরের দূতরূপে রামমোহন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যান। তাঁরই চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহের বার্ষিক ভাতা তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। ইংলণ্ডে রামমোহনের গভীর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও মনীষায় মুগ্ধ হয়ে বহুলোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর এই মহাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ব্রিষ্টল শহরে। আমাদের রামমোহন ছিলেন ভারতপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক।

"একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে—
আত্মার আত্মীয়।"

অনুশীলনী

১। রামমোহনের জীবনে নির্ভীকতার পরিচয় দাও।

২। রামমোহনের ধর্মমত প্রচার ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

।। মহম্মদ মহসীন ।।

"সবহারাদের যত দুঃখ-ব্যথা
তোমারই বিকাশ মাঝে।"



হাজী মোহাম্মদ মহসীন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ফৈজুল্লা। শৈশবকাল থেকেই মহসীন খুবই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। লেখাপড়ার দিকে তাঁর খুবই আকর্ষণ ছিল। হুগলীতে বেশ কিছুদিন লেখা-পড়া করার পর তিনি চলে যান মুর্শিদাবাদ। সেখানে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করেন মৌলবীদের নিকট থেকে। মহসীনের হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর ছিল। মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরানের নীতি উপদেশগুলো তিনি জীবনে মেনে চলতেন। সৎভাবে জীবন যাপন করতেন তিনি। সৎচিন্তা ছিল তাঁর আদর্শ। সৎগ্রন্থ পাঠ ছিল জীবনের ব্রত। মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি ফিরে এলেন। এবার বের হলেন দেশভ্রমণে। নানা দেশ পরিভ্রমণ,

করলেন। অন্তরে জাগ্রত হলো এক নবচেতনা। জনসেবার ব্রত গ্রহণ করলেন জীবনে। আরব, পারস্য ও আফ্রিকার নানা প্রদেশে ঘুরে ঘুরে বিশ্বের সাথে তাঁর পরিচয় হলো। কত মানুষের সংস্পর্শে এলেন। মহসীনের বোন মন্নুজানের চিঠি পেয়ে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। তাঁর বোন ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী। তাঁকে এসে দেখাশোনা করার জন্যই তিনি চিঠি দিয়েছিলেন মহসীনকে। স্নেহের আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেননি মহসীন। কিছুদিন পরেই স্নেহময়ী ভগ্নী পরলোক গমন করেন। ফলে মহসীন হলেন ভগ্নীর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। মহসীনের চারদিকে এখন শুধু প্রাচুর্য। কিন্তু অর্থের এই প্রাচুর্য তাঁকে অহংকারী করে তুলতে পারে নি। এই সজ্জন শুধু জ্ঞানচর্চা করতেন আর পরোপকার করে জীবনে বিমল আনন্দ পেতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। কি গরীব, কি ধনী—সবাই তাঁর ছিল প্রিয়—আপনার জন। দুঃখীর দুঃখ মোচন করবার জন্য তাঁর কী বিপুল আগ্রহ ! রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশ ধারণ করে সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য বের হতেন। এমনি করে দুঃখীর চোখের জল মুছে দিতেন আপন হাতে। অর্থ দিয়ে—উপদেশ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। শিক্ষার প্রসারকল্পে তাঁর দান অপরিসীম। তিনি এটা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন যে শিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে পারে না। মহসীনের অর্থানুকূল্যে আজো বহু মুসলমান ছাত্র লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই বৃত্তির নাম "মহসীন বৃত্তি।" মহসীন বলতেন—

সাধুসঙ্গ জীবনের কাজে প্রেরণা দেয়। তাঁর এই বাণী আমাদের মনে রেখে চলা উচিত। অর্থদান করবার সময় মহসীন নিজের কথা ভাবতেন না। এমনি ছিল তাঁর দানের নেশা। একদিন এক দুঃখী এসে তাঁর কাছে তার বেদনার কথা জানালো। মহসীনের চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠলো। তিনি বললেন—আমার কাছে এখন যা আছে, তাই নাও। এই বলে লোকটির হাতে অনেক টাকা তুলে দিলেন। টাকা নিয়ে লোকটি চলে গেল। তখন তাঁর এক প্রতিবেশী এসে বললেন—ও লোকটি মিথ্যে কথা বলে টাকা নিয়ে গেল। দানবীর মহসীন বললেন—না, না, না, তা হতেই পারে না।

মানুষের দুঃখের কথা শুনলে মহসীন এমনি ভাবে অধীর হয়ে উঠতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে গেছেন।

পরদুঃখকাতর, দানবীর মহসীন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

"সার্থক হোক সকল মানব
জয়ী হোক ভালোবাসা।"

অনুশীলনী

১। বাল্যকালে মহসীনের লেখাপড়া কোথায়, কি ভাবে হয়েছিল।

২। মহসীনের জনসেবার কথা সংক্ষেপে লিখ।

॥ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

"মহা বিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে
নাচিতে নাচিতে—
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।"



সত্যের আলো জ্বালিয়ে যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, তাঁদের সামনে দুর্গম পথ। সেই পথে যদি কেউ সাথী না হয়, তবু সেই মহান পথিক একলাই চলে। সে নির্ভিক। শত অত্যাচার বুক পেতে নেয় সে। তেমন সত্যাশ্রয়ী জননেতা ছিলেন আমাদের সুরেন্দ্রনাথ। জন্ম তাঁর ১০ই নভেম্বর, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। কোলকাতা তালতলা পল্লীতে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নামকরা ডাক্তার ছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই সুরেন্দ্রনাথ পাঠে খুবই মনোযোগী ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমনি পরিশ্রমী। স্কুল-কলেজের

পাঠ ভালোভাবে শেষ করে সুরেন্দ্রনাথ গেলেন বিলেতে। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। এই পরীক্ষা দেবার ব্যাপারে তাঁকে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। এই পরীক্ষা দেবার জন্যে যে বয়স ঠিক করা ছিল, সুরেন্দ্রনাথের বয়স ছিল তার চেয়ে কিছু বেশী। অন্য সব রকম যোগ্যতা তাঁর ছিল। কিন্তু ঐ বয়সের ব্যাপারে তিনি পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন না।

তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। উদগ্র আকাঙ্ক্ষার আগুন যার প্রাণে নিরন্তর জ্বলে, সে কি বসে থাকতে পারে? প্রতিবাদে তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। মামলা আরম্ভ করলেন বিলেতের আদালতে। ভারতীয় সময়—তারিখ অনুযায়ী গণনায় সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দেবার বয়স অপেক্ষা তার বয়স কম প্রমাণিত হলো। আদালতের বিচারক তাঁকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিলেন। পরিশ্রমী, মেধাবী সুরেন্দ্রনাথ ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে এলেন।

তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই নবীন তেজস্বী যুবককে শ্রীহট্ট জেলার সহকারী জেলা শাসকের পদে বসালেন। শ্রীহট্টে তখন জেলা শাসকের কাজ করছিলেন একজন ভারতীয় ইংরেজ। তার নাম এইচ. সি. সাদারল্যাণ্ড। আপন কর্তব্যকর্মে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাধীন-চেতা। যা কিছু সত্য তাকে প্রকাশ করাই সুরেন্দ্রনাথের ধর্ম। সাদারল্যাণ্ড সাহেব সুরেন্দ্রনাথের কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে আদালতে দায়ের করলেন মিথ্যা নালিশ। সুরেন্দ্রনাথ চাকুরী থেকে অপসারিত হলেন কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন নরিস্ সাহেব। সুরেন্দ্রনাথ তার কাজের সমালোচনা করে সাহেবের বিরুদ্ধে একটা কড়া প্রবন্ধ লিখলেন দৈনিক ইংরাজী কাগজ "বেঙ্গলী"-তে। এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন সুরেন্দ্রনাথ নিজে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন ইংরেজ সরকার সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করলেন। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর দুমাসের জেল হলো। কিন্তু জনসাধারণ সুরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতায় মুগ্ধ হলেন। তাঁরা দেখলেন—এই তেজস্বী পুরুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে দেশের নেতৃত্ব। বরণ করে নিলেন তাঁরা সুরেন্দ্রনাথকে দেশনেতা রূপে।

"যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা
নববৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা।"

এই স্বদেশের দীক্ষাই দান করে গেছেন আমাদের সুরেন্দ্রনাথ।

অনুশীলনী

১। সুরেন্দ্রনাথ কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর পিতার নাম কি? তাঁর পিতা কি ছিলেন?

২। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতার পরিচয় দাও।

॥ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ॥

"বীর সিংহের সিংহ-শিশু বিদ্যাসাগর বীর,
উদ্বেলিত দয়ার সাগর বীর্যে সুগম্ভীর।"



মেদনীপুরজেলার এক নিভৃত গ্রাম বীরসিংহ। সেখানে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খুবই দরিদ্র। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর লেখাপড়া শুরু হলো। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন খুবই মেধাবী। পুত্রকে আরো লেখাপড়া শেখাতে হবে। ঠাকুরদাস একদিন পুত্রকে নিয়ে চললেন কলকাতা। পায়ে হেঁটেই চললেন তাঁরা। পায়ে চলার পথের ধারে মাইল স্টোনের সংখ্যা দেখে দেখে বালক ঈশ্বরচন্দ্র এক, দুই, তিন—সব ইংরেজী সংখ্যা শিখে ফেললেন। কলকাতা এসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। কলকাতার বাড়ীতে তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। দু'বেলা রান্নার কাজ নিজের হাতে করতেন। বাসন

মাজতেন। এইসব কাজ করতে হত বলে অনেক রাত হয়ে যেত। ঘরের আলোর অভাবে পথে গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে পড়তেন। এত অসুবিধার মধ্যেও ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করতেন। শুধু সংস্কৃতেই তিনি পণ্ডিত হননি, বাংলা, ইংরেজী এমন কি হিন্দী ভাষাতেও দক্ষতা লাভ করেছিলেন। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাই বাংলার পণ্ডিতসমাজ তাঁকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত ক'রে সম্মানিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকরূপে। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। বেতন পঞ্চাশ টাকা। পরে সংস্কৃত-কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। সেখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হলো না। ওখান থেকেও সরে আসেন। পরে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাইনে পেতেন পাঁচ শত টাকা। এই স্বাধীনচেতা নির্ভীক পুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি 'মেট্রোপলিটান' কলেজ প্রতিষ্ঠা। এই কলেজই আজ বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। তাঁর আন্তরিক চেষ্টাতেই এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেও তাঁর চেষ্টা বড় কম ছিল না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় তাঁর দানের তুলনা নেই। বাংলাভাষাকে নূতনভাবে গড়েছিলেন তিনি। তাঁর 'বাল্য-পাঠ,' 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'সীতার বনবাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি গ্রন্থ চিরপরিচিত ও আদৃত।

তিনি খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের আদেশ রক্ষা করবার জন্য

তিনি ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে একদিন দামোদর নদ সাঁতার দিয়ে পার হয়েছিলেন। এমনি করে মাতাপিতাকে ভক্তি করতেন। তাঁর কাছে মাতাপিতাই যেন ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা—অন্নপূর্ণা আর বিশ্বেশ্বর। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা বিস্ময়কর। একে তিনি ছিলেন সেকালের এক ব্রাহ্মণ-সন্তান, তার উপরে ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। কাজেই তাঁর মতো একজন লোক যে, এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে অগ্রণী হবেন সেকথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। বিদ্যাসাগর ছিলেন সকল সংস্কারমুক্ত, উদার পুরুষ। বাল-বিধবাদের দুঃখ দেখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হলো। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক বালবিধবার বিবাহ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে পত্র লিখেছিলেন—

"আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।"

তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। তাঁর অর্থে যে কতো বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল তার ইয়ত্তা নেই। কত ছাত্র, কত বিধবা, কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যে তাঁর দান গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। পথের ধারে রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে এক রোগী। দেখে বিদ্যাসাগরের দয়া হলো। তখনি রোগীটিকে নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হলেন। এইভাবে রাস্তায় পড়ে থাকা কলেরা রোগীর জীবন রক্ষা হলো বিদ্যাসাগরের দয়ায়। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। তাঁর চলায়, কথায়, আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠ্‌তো

বাঙালীর গৌরব। এই সংস্কারমুক্ত পুরুষ একবার তাঁর অসুস্থ পিতাকে নিয়ে কাশীধামে যান। কাশীধামে থেকে বিশ্বেশ্বরের মূর্তি দর্শন না করায় পাণ্ডারা ক্ষুব্ধ হয়ে তার কারণ জানতে চায়। উত্তরে তিনি. বলেন—"আমার গৃহেই বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা বিরাজিত। তাঁদের সেবা না করে আমি দেবদেবীর সেবা করতে প্রস্তুত নই।" এককথায় ধর্মের নামে আচার-নিষ্ঠাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কিন্তু ইহলোকের মানুষ তাদের অন্তরের মণিকোঠায় শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে বসিয়েছে চিরকালের জন্য।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন বর্ণনা কর।

২। বিদ্যাসাগরকে কেন দয়ার সাগর বলা হয়?

৩। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদরকে কি লিখেছিলেন?

॥ বাঘা যতীন ॥

মুক্তি চাই—মুক্তি চাই
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই ;
জয় গাহ আজি দেশ-মাতার
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার।



এই মুক্তি-পাগল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভূমি ছিল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার রিস্‌খালি গ্রামে। তাঁর মামার বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রামে। সেখানেই যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

তিনি শৈশবেই পিতাকে হারান। মানুষ হয়েছিলেন মাতুলালয়ে। দেহে প্রচুর শক্তি ছিল তাঁর। সাহসী ও বেপরোয়া ছেলেবেলা থেকেই। শৈশব কাটিয়ে যুবক যতীন্দ্রনাথ একদিন একজন সঙ্গী নিয়ে শিকার করতে বের হলেন বনে। সঙ্গীর হাতে বন্দুক আর যতীন্দ্রনাথের হাতে ভোজালি। জঙ্গলে তাড়া খেয়ে একটা বাঘ বেরিয়ে এলো। সামনেই ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। বাঘ তাঁর ওপর পড়লো ঝাঁপিয়ে। লড়াই চললো বাঘে-মানুষে। বাঘ যতীন্দ্রনাথকে

কামড়াচ্ছে, আঁচড় দিচ্ছে গায়ে নখ দিয়ে। বীর যতীন্দ্রনাথ ভোজালির কোপ মেরে চলেছেন। যতীন্দ্রনাথের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল আর বাঘ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মৃতপ্রায় যতীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। হাতাহাতি লড়াই করে বাঘ মেরেছিলেন বলে তাঁর নাম হলো 'বাঘা যতীন'।

আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর জীবন-ব্যর্থ হয়নি। তাঁদেরই পদাংক অনুসরণ করে মরণ খেলায় মেতে উঠলো শত শত বাঙ্গালী যুবক। বিপ্লবীরা ঠিক করলেন, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। ইংরেজ রাজত্বের অবসান চাই। এর জন্য চাই অস্ত্র আর সাহসী সৈনিক। শক্তিশালী নেতা না হলে সংগ্রাম চালাবে কে? বিপ্লবীরা একমত হয়ে তাঁদের নেতা করলেন যতীন্দ্রনাথকে।

বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায় বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করার ভার নিলেন। রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ভারতীয় সৈন্যদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন। ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজী হলো। ঠিক হলো তৎকালীন জার্মান সরকার অস্ত্র যোগাবেন। প্রথমেই তাঁরা দখল করবেন সরকারী অস্ত্রাগার। বিদেশ থেকে আনা অস্ত্র ভারতীয় সৈন্যদের হাতে দেওয়া হবে। বাংলার—মারাঠার—পাঞ্জাবের—সকল প্রদেশের বিপ্লবীদল এক সাথে যুদ্ধ করবেন। হঠাৎ ঘটলো অঘটন। ইংরেজ সরকারের এক গুপ্তচর ছিল সৈন্যদলে। সে এই বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দিল সরকারের কাছে। সরকার তৎক্ষণাৎ

গোরা সৈন্য দিয়ে সেনানিবাস এবং সব দুর্গ ঘিরে ফেললো। ভারতীয় সৈন্যরা তবু লড়াই করলো। তাদের মধ্যে অনেকেই বন্দী হলো—বহু সৈন্য প্রাণ হারালো। বিচারে অনেকের ফাঁসি হলো।

বিপ্লবীরা কিন্তু এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। এ যেন 'অকস্মাৎ বজ্রপাত'। বিপ্লবীদের মধ্যেও অনেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো। রাসবিহারী আর মানবেন্দ্র গোপনে পালিয়ে গেলেন ভারতের বাইরে। ময়ূরভঞ্জের এক গভীর বনে যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন সাথীকে নিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। পুলিশ তাদের ঘিরে ফেললো। যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্যে। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। যতীন্দ্রনাথের দলে মাত্র পাঁচজন আর পুলিশ সৈন্যের সংখ্যা হাজার। পুলিশের অস্ত্র ছিল প্রচুর। যুদ্ধ করতে করতে বিপ্লবীদের বন্দুকের গুলি গেল ফুরিয়ে। সশস্ত্র পুলিশের দল এসে পড়লো নিকটে। সম্মুখ সমরে বীরের মৃত্যুবরণ করলেন যতীন্দ্রনাথ।

"বীরের এ রক্ত স্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি, ধরার ধূলায় হবে হারা?"

অনুশীলনী

১। যতীন্দ্রনাথের নাম 'বাঘা যতীন' হলো কেন?
২। বাঘা যতীনের বীরত্বের কথা আলোচনা কর।

॥ বিনয়-বাদল-দীনেশ ॥

"দেশ-মাতার আর বিশ্বমাতার,
ম্লেচ্ছ, কাফের, এক পরিবার ;
নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার,
জন্মমৃত্যুর এই যে ঠাঁই।"

১৯৩০-এর ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম শহর থেকে তিন মাইল দূরে জালালাবাদ পাহাড়ে অমর বিপ্লবীনেতা মাষ্টারদার নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যের সাথে আমাদের বিপ্লবীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বীর বিপ্লবীদের রক্তে ধন্য পবিত্র হলো আমাদের মাতৃভূমি। "জন্মমৃত্যুর এই যে ঠাঁই"—এটা দেশের মানুষ বুঝে গেল অন্তর দিয়ে। সব দেখে শুনে ইংরেজ সরকার ভয়ে কেঁপে উঠলো। তারা বাংলা জুড়ে আরম্ভ করলো তল্লাসী আর গ্রেপ্তার। তাদের সব ক্রোধ গিয়ে পড়লো বিপ্লবীদের ওপর। টেগার্ট সাহেব তখন ছিলেন কোলকাতার পুলিশ কমিশনার। তার দুর্দান্ত প্রতাপে সারা বাংলা সন্ত্রস্ত। চলেছে অত্যাচার—উৎপীড়ন—জুলুম, নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর। বিপ্লবীদল ঠিক করলেন গোপন বৈঠকে যে তারা ঐ টেগার্ট সাহেবকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন। কোলকাতা ডালহৌসী স্কোয়ারের পথ দিয়ে টেগার্ট সাহেব একদিন যাচ্ছিলেন। বিপ্লবীরা বোমা ছুঁড়ে মারলো তার গাড়ী লক্ষ্য করে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। বোমা ফাটলো সাহেবের গাড়ীর ঠিক পেছনে। বেঁচে গেল সাহেব।

বোমার আঘাতে বিপ্লবীদের একজন প্রাণ হারালো। আর একজন আহত অবস্থাতেই বন্দী হলো। বিনয়-বাদল-দীনেশদের বিপ্লবীদল সমগ্র ঘটনার পর্যালোচনা করলেন গোপনে। এই পথে যারা একবার নেমেছে তারা কি চুপ করে থাকতে পারে ?

পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যান সাহেব তখন ছিলেন ঢাকায়। তার অত্যাচার ও জুলুম কম নয়। হড্‌সন্ সাহেবকে নিয়ে .তিনি একদিন ঢাকার হাসপাতাল দেখতে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী বিনয় দাস তখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। তিনি ঐ দুই সাহেবকেই গুলি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। গুলির আঘাতে লোম্যান সাহেব মারা গেলেন আর হড্‌সন্ সাহেব ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। দিকে দিকে পুলিশ, গুপ্তচর ছুটলো বিনয়কে বন্দী করতে। সারা বাংলা দেশ তোলপাড় করছে তারা। এদিকে বিনয় তখন গোপন বৈঠকে কোলকাতায় বসে মতলব আঁটছেন কি করে ইংরেজ সরকারের প্রধান কার্যালয় রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করা যায়। কি করে ওদের সব কাজ স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। বিনয়ের সঙ্গী দু'জন—দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর বোস। তাঁদের পরনে সাহেবী পোষাক। তাঁরা অনায়াসে রাইটার্সে ঢুকে গেলেন। কারো মনে কোন সন্দেহ জাগালো না। প্রথমেই ঢুকলেন তাঁরা সিম্পশন্ সাহেবের ঘরে। এই সাহেব ছিলেন কারা বিভাগের পরিদর্শক। এক মনে তিনি কাজ করছিলেন তার টেবিলে। অতর্কিতে বিপ্লবীরা গুলি করলো তাকে। গুলির আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হলেন। গুলির প্রচণ্ড শব্দ শুনে সাহেবের সেক্রেটারী ছুটে এলেন তাকে

সাহায্য করতে। তিনিও বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে প্রাণ হারালেন। সমস্ত বাড়ীটার লোক চঞ্চল হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী এলো ছুটে। বিপ্লবীরা তখন বুঝলেন— এ বাড়ী থেকে বের হওয়া কঠিন। তারা তখন একটা ঘরে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিলেন। ইংরেজ সৈন্যের হাতে তাঁরা ধরা দেবেন না—এই ছিল তাঁদের পূর্ব পরিকল্পনা। বাদল বিষপান করে আত্মহত্যা করলেন। বিনয় ও দীনেশ ইংরেজদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সবশেষে গুলি চালালেন আপন আপন মাথা লক্ষ্য করে। তবু আত্মসমর্পণ তারা কিছুতেই করবেন না। বিনয় মারা গেল। অনেক চিকিৎসা করে দীনেশকে বাঁচিয়ে তুললো ইংরেজ সরকার। বিচারে দীনেশের ফাঁসির হুকুম হলো। নির্ভীক দীনেশ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে শেষবারের মতো বললো —"বন্দে মাতরম্"…ধীরে ধীরে দীনেশের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল।

"কায়া নাই, তবু ছায়াখানি তার,
রাখি নয়নের আগে।"

অনুশীলনী

১। কোলকাতার পুলিশ কমিশনার কে ছিলেন ?

২। "বিনয়-বাদল-দীনেশ" এদের বীরত্বের কথা লিখ।

॥ নেতাজী সুভাষ ॥

"যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন।"



ভারত তথা বিশ্বের বিস্ময় নেতাজী সুভাষ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী কটকে তাঁর জন্ম। পিতা জানকীনাথ বসু। তিনি ছিলেন কটকের খ্যাতনামা উকিল। কটক থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। ছেলেবেলা থেকেই সুভাষ ছিলেন বিনয়ী ও নম্র। কিন্তু কেউ আঘাত করলে গর্জে উঠতেন সিংহের মত। সুভাষ যখন ঐ কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র তখন সেখানে ওটেন নামক এক ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন। মিঃ ওটেন একদিন ভারতীয়দের সম্বন্ধে অপমানজনক কথা বলেন। সুভাষ তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করেন এবং সেই অপমান সূচক মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে বলেন। উদ্ধত অধ্যাপক তীব্র নিন্দা সূচক মন্তব্য করলেন সুভাষের প্রতি। মর্মাহত সুভাষ অধ্যাপকটিকে দু'এক ঘা কষে

দিলেন। এই অপরাধে সুভাষকে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হলো। পরে বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি কোলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. পাশ করেন। তখন সামরিক শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর গঠিত হয়। সুভাষ-চন্দ্র সেখানে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর চলে যান বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য। এই পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করে ভারতে ফিরে এলেন। সরকারী চাকুরী না নিয়ে দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন তরুণ সুভাষ। মহাত্মাজীর নির্দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুভাষ। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্তা হলেন। সেখানে জনহিতকর কাজে তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। বেশী দিন কর্পোরেশনের কাজ করতে পারেন নি। শুরু হলো কারাবরণের পালা। প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো তাঁকে, পরে সেখান থেকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে অত্যন্ত গরমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ধীরে ধীরে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে কোলকাতায় এনে চিকিৎসা করা হয়। আড়াই বছরেরও বেশী কারাবাসের পর ১৯২৭ সালের ১৬ই মে নেতাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি লাভের পর কলকাতা কর্পোরেশন তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানান।

১৯২২ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কর্মশক্তি ব্যয়িত হয় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে। যুদ্ধের পথে ভারতকে মুক্ত করতে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। ভারতের গণজাগরণের অধিনায়ক গান্ধীজীর প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। জাতীয় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন ইংরেজ সরকার। সুভাষের আদর্শ ছিল—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" দেশের তরুণ-শক্তির কাছে তিনি ছিলেন এক বিরাট আদর্শের প্রতিমূর্তি। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। পরপর দু'বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন বেজে ওঠে সুভাষচন্দ্র তখন ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে চরম পত্র দেবার জন্য কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে সুভাষচন্দ্র দেশের বামপন্থী শক্তিগুলোকে বহিঃশক্তির সাহায্যে দুর্জয় করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। সরকার তখন তাঁকে বন্দী করে রাখেন নিজগৃহে। কিন্তু সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি চলে গেলেন জার্মানীতে। যেসব দেশ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তাদের সাহায্য নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করা সহজ বলেই তিনি ভেবেছিলেন। জার্মানী থেকে গেলেন জাপানে। সেখানে রাসবিহারী বসুর সাহায্যে গড়ে তুললেন এক বিরাট সেনাদল। যেসব ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিল, জাপান সরকার তাঁদের ছেড়ে দিলেন সুভাষের হাতে। তাঁরা সানন্দে মেনে নিলো সুভাষের নেতৃত্ব —অভিবাদন জানালে "নেতাজী" বলে। গড়ে উঠলো আজাদ

হিন্দ বাহিনী। তাঁদের "দিল্লী চলো" ধ্বনিতে ইম্ফল-প্রাঙ্গণ মুখরিত হলো—আন্দামানে দেখা গেল জাতীয় পতাকা। সুভাষের এই কীর্তিকলাপ যখন ছড়িয়ে পড়লো ভারতে, তখন ভারতবাসী দ্বিগুণ উৎসাহিত হলেন। ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব ইংরেজ সরকার বুঝেছিলেন। কোন উপায় না দেখে ইংরেজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হলেন। দেশ স্বাধীন হলো ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট। নেতাজীর স্বপ্ন সফল হলো। কিন্তু স্বাধীন ভারত ফিরে পেল না এই বীর সন্তানকে। যৌবনের প্রতীক, যুবশক্তির চিরকালের আদর্শ নেতাজী সুভাষ চিরদিনের মত রয়ে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু ভুলব না আমরা তাঁর বাণী—

"আমাকে রক্ত দাও—আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তোমার আসন শূন্য আজি
হে বীর পূর্ণ কর।"

অনুশীলনী

১। সুভাষচন্দ্রের কলেজ-জীবনের ঘটনা বর্ণনা কর।

২। দেশের স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্র যে সংগ্রাম করেছেন তার ইতিহাস লিখ।

।। বিপ্লবী সাধক শ্রীঅরবিন্দ ।।

ত্যাগ-দীপের ভাস্বর-শিখা,
জ্বালিলে দীপ্তিময়,
জয়, তব জয় জয় !



বিপ্লবযুগের প্রধান ঋত্বিক অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন বিলেত ফেরত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁর মাতামহ। অরবিন্দের জীবন শুরু হয় পিতার আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায় তিনি পুরোদস্তুর সাহেবই হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতা সপরিবারে বিলেতে গেলেন। লণ্ডনে সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে শ্রী অরবিন্দ ভর্তি হন। তারপর পড়েন কিংস্ কলেজে। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য পাঠেই ছিল তাঁর বিশেষ আনন্দ। কিংস্ কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ করে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আই. সি. এস্. পরীক্ষা দেবার সময় তিনি প্রথমে বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। এই পরীক্ষার সকল বিষয়ে তিনি

পাশ করেন। ঘোড়ায় চড়া ভালো জানা না থাকায় তাঁর ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরি হলো না। এই সময়ে অরবিন্দের পিতার মৃত্যু ঘটে। তিনি বিলেত থেকে ভারতে ফিরে এলেন। বরোদার শিক্ষাবিভাগে। উঁচু পদে নিযুক্ত হলেন। গাইকোয়াড় শ্রীঅরবিন্দকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। বেশ কিছুদিন শিক্ষা বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগে কাজ করে তিনি বরোদা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। বরোদা থেকে চলে এলেন বাংলায়। তাঁর চিন্তা হলো কি করে দেশকে স্বাধীন করা যায়। তখন স্বাধীনতার চেতনায় জনগণের মনে বিপুল আন্দোলন চলছে। বাংলা তখন বিদেশী জিনিষ ব্যবহার ত্যাগ করছে। বাংলা তাঁকে পেয়ে ধন্য হলো। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন অরবিন্দ। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবার জন্যে কলম ধরলেন তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে। এই ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার বাণী প্রচারে অরবিন্দ সফল হয়েছিলেন। তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন বারীন ঘোষ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বীর বিপ্লবীদল। "বন্দে মাতরম"এর অগ্নিক্ষরাভাষা দেখে ইংরেজ শংকিত হলো। বন্দী হলেন অরবিন্দ। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশের লোক প্রমাণ করতে পারেনি যে অরবিন্দই 'বন্দেমাতরম'-এর সম্পাদক। প্রমাণের অভাবে তিনি ছাড়া পেলেন। এইবার হিংসাত্মক উপায়ে ইংরেজকে দেশছাড়া করার গোপন চেষ্টা চলতে লাগল। এই যুবকদলের নেতা ছিলেন অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। মাণিকতলায় অরবিন্দের একটা বাগানবাড়ী ছিল। সেখানে তাঁদের গোপন আড্ডায় তৈরী হতো ইংরেজ-হত্যার জন্য বোমা।

অরবিন্দ তখন ৪৮ নম্বর গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়িতে থাকতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে। তখন ভোরবেলা। পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলে। ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রেগান সাহেব পুলিশ ইন্সপেক্টর বিনোদ গুপ্তকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। অরবিন্দ তখন একটা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে। ক্রেগান সাহেবের ধারণা ছিল অরবিন্দ একজন দুর্ধর্ষ লোক। তার একার পক্ষে তাঁকে ধরা যাবে না। অরবিন্দকে একটা ছেঁড়া মাদুরে বসে থাকতে দেখে তার বিশ্বাসই হয় না, উনিই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। বন্দী হলেন শ্রীঅরবিন্দ। শুরু হলো ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলা। পুরো একবছর অরবিন্দকে হাজতে থাকতে হলো। বিপ্লবীদের পক্ষে মামলা পরিচালনার ভার নিলেন তরুণ ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সমগ্র দেশ তাকিয়ে আছে এই মামলার ফলাফলের দিকে। আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা, আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।" মামলা চলতে লাগল। নির্জন কারাকক্ষে অরবিন্দ প্রতিদিন নূতন নূতন অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভ করতে লাগলেন। কারাগারে তিনি ভগবান বাসুদেবকে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। মামলার শুনানী শেষ হলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করলেন, শ্রীঅরবিন্দ নির্দোষ। সসম্মানে মুক্তি পেলেন অরবিন্দ। সেদিনের আদালত কক্ষে দেশবন্ধু বলেছিলেন—"আজকের এই বিচার সম্পর্কে যেদিন তর্ক-বিতর্কের অবসান হয়ে যাবে, যেদিন সকল আন্দোলন ও

উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটবে, যখন শ্রীঅরবিন্দ এ মর্ত্যধামে জীবিতও থাকবেন না, সেদিন জগৎবাসী তাঁকে দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার উদ্গাতা, বিশ্বপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে।" দেশবন্ধুর সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। তারপর শ্রীঅরবিন্দ চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে। সেখানে ১৯১০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর দুশ্চর সাধনা করেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'দিব্যজীবন' ও 'কাব্য সাবিত্রীর' ছত্রে ছত্রে আধ্যাত্মসাধনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫০-এর ৬ই ডিসেম্বর ১টা ২৬ মিনিটে শ্রীঅরবিন্দ দেহরক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'নমস্কার' কবিতার ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের বন্দনা করি।

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।"

অনুশীলনী

১। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অরবিন্দ কি বলেছিলেন?

২। বিপ্লবী অরবিন্দের জীবনকথা লিখ।

।। দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ।।

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার
যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার
জাগিবে তখনি।"



এই পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী আলো করে জন্মগ্রহণ করেন ১২৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধনীর পুত্র। দাস-দাসীতে ভরা বিরাট বাড়ী। ঐশ্বর্য খুব। তবু সাধারণ ভাবেই তাঁর দিন কেটেছিল শৈশবে। বাড়ীর চাকরদের কড়া শাসন ছিল তাঁর উপর। তাদের কাছে শুনতেন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প। নিরিবিলিতে বসে থাকতেন জানালার ধারে আর বাইরের দিকে দেখতেন নীলাকাশ, বুড়ো বটগাছ আর পুকুর। কাঠের একটা সিঙ্গি ছিল—তাকে নিয়ে ছেলেবেলায় ছড়া লিখেছিলেন।

"ছোট্ট কাঠের সিঙ্গি আমার
ছিল ছেলেবেলায়
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীর·পুরুষি খেলায়।"

তাঁর ছেলেবেলার আর একটি কবিতা—

"আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে
কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

এমনি করে তার কাব্যচর্চা চল্‌ছিল। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সাথে নানা দেশ ঘুরেছেন। কবিতা ও গান রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বালক রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর পিতাকে গান শোনালেন। খুশী হয়ে মহর্ষি তখনি তাঁকে ৫০০ টাকা উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—"দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত, এমন সাহিত্যের কদর বুঝিত, তবে কবিকে পুরস্কৃত করিত।" মাত্র পনের বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ স্কুলের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ীতেই অধ্যয়ন করতেন। পরবর্তীকালে আইন পড়ার জন্য তিনি বিলেত যান। বিলেতে থাকাকালীন নানা প্রলোভনের মধ্যেও তিনি ভারতীয় আদর্শকে ভুলে যাননি কখনো। দেশপ্রেমের আদর্শ ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। ইংরেজ সরকারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদাই মুখর। মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভরে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেন।

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার' বিভিন্ন কাজকর্মে ছেলেবেলাতেই যোগদান করেন বাড়ীর অন্যান্য কিশোরদের সাথে। বঙ্গভঙ্গ-রদ-আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ সাড়া দেন। তাতে তাঁর স্বাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিনি কংগ্রেস-সম্মেলনে যোগদান করেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রাখীবন্ধনের আয়োজন করেছেন। জাতীয়-সঙ্গীত রচনা করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান।"

'আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি।' 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।' 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু এখন, ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার।'—প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ দেশের কোন অপমানকে সহ্য করেননি। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে যখন ইংরেজরা সাধারণ ভারতবাসীর ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল, গুলি করে হত্যা করেছিল অসংখ্য মানুষকে, রবীন্দ্রনাথ সেদিন প্রতিবাদে গর্জে উঠেন। সেদিনই 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে চিঠি দেন। তাছাড়া মিস্ র‍্যাথবোনের ভারতবিদ্বেষী চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ মুখর হয়ে উঠেন। হিজলীর বন্দীশিবিরে দেশের বিপ্লবী যুবকদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর

বিরুদ্ধে তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতিবাদ করেন। বিদেশী-শাসনের ফলে ভারতের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ আছে তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে?' রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদকে কোন দিনই সমর্থন করেননি। জাতীয়তার চেয়ে মানবতা অনেক বড়। যে জাতীয়তা মানুষের মনে ভালোবাসা ও ঐক্য জাগিয়ে তোলে তার সমর্থক রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসতেন—তাই তিনি বিশ্বকবি ও মহামানব। বিশ্বের যেখানেই তিনি গেছেন, ভারতের মৈত্রী, করুণা ও সাম্যের বাণী শুনিয়েছেন। কবির 'শান্তি-নিকেতন' বিশ্ববাণীর উৎসস্বরূপ।

১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণের এক বর্ষণমুখর দিনে এই পৃথিবীর কবি অমরধামে যাত্রা করেন। তবু মানুষের মাঝেই তিনি আজো অমর হয়ে আছেন।

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।"

অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা অল্প কথায় লিখ।

২। দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দাও।

॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে,
জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে।"

পাঁচশ' বছর আগের কথা। নবদ্বীপের গঙ্গাতীর। স্নান সেরে অনেকেই জপ করছে। পাশেই পূজার ফলমূল। সেখানে একটি ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় দুষ্টু। লোকের পূজোর ফলফুল নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিচ্ছে। নবদ্বীপের লোকে এই ছেলেটির দৌরাত্ম্যে অস্থির। ছেলের মায়ের কাছে অনবরত অভিযোগ আসছে। মা খুব রেগে গেছেন। লাঠি নিয়ে ছেলেকে তাড়া করলেন। বাড়ীর এককোণে ছিল আবর্জনার স্তূপ। শাস্তি এড়াবার জন্যে ছেলে ছুটে গিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। মা ছেলেকে নেমে আসতে বললেন। ছেলে নির্বিকার। মা হার মানলেন। হাতের লাঠি ফেলে দিলেন। ছেলে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। এই দুষ্টু ছেলেটির নাম নিমাই। বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মায়ের নাম শচীদেবী। নিমাই এর গায়ের রং গৌরবর্ণ। নবদ্বীপের লোক ডাকত গোরা বা গৌরাঙ্গ বলে। পিতা জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে টোলে ভর্তি করে দিলেন। তাঁর মেধা অদ্ভুত। খুব অল্পদিনেই সব শাস্ত্র পড়ে ফেললেন, ক্রমে তাঁর পাণ্ডিত্য দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। নিজেই টোল খুললেন। অনেক ছাত্র হলো সেখানে। এই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হল। পিণ্ড দেবার জন্যে তিনি গেলেন গয়াতে। গয়ার মন্দিরে বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণাম করলেন তিনি। ভাবান্তর হলো

তাঁর। ভাবে আবিষ্ট হয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। মন্দিরের বাইরে ছিলেন এক সন্ন্যাসী। এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী। তিনি তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। নিমাই ফিরে এলেন নবদ্বীপে। মুখে তাঁর কৃষ্ণনাম। পড়াশুনোতে তাঁর মন নেই। ভাবেন শুধু কৃষ্ণের কথা। ছাত্রদেরও বলেন—শুধু কৃষ্ণনাম কর। শাস্ত্র পড়া ছেড়ে দিলেন নিমাই। শাস্ত্র পড়ে কি ভগবানকে পাওয়া যায়? তাঁকে ডাকতে হবে—কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে, প্রেমে আর ভক্তির টানে। তর্ক দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। এইসব দেখে শচীমা শংকিত হলেন। শচীমার আহার নেই—নিদ্রা নেই। কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনেও সুখ নেই। নিমাই আর এখন ঘরে থাকেন না। নবদ্বীপের পথে পথে নেচে নেচে নামকীর্তন করে বেড়ান। ভগবানের নামগান শুনে কতলোক কীর্তনে যোগ দেয়। উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, সকলেরই সমান অধিকার নামগানে।

তখন পাঠান-সুলতানদের আমল। হিন্দুসমাজ কুসংস্কারে ভরা। নিম্নবর্ণের লোকদের জন্য ছিল পৃথক মন্দির। তাদের দেবতা ছিলেন ধর্মরাজ। উচ্চজাতির দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার তাদের ছিল না। তাদের ছায়া মাড়ালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিজেদের অশুচি মনে করে। তাই এদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সমাজপতিদের তবুও চৈতন্য নেই। তাঁরা নিমাই-এর নামগান পছন্দ করেন না। তাঁরা নিমাইকে বলেন পাগল। কাজীর দরবারে তাঁরা নালিশ করলেন যে নিমাই-এর জন্যে হিন্দুধর্ম নষ্ট হচ্ছে। কাজী আদেশ দিলেন যে নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম বন্ধ করতে হবে। নিমাই এ আদেশ মানলেন না। ভক্তদের নিয়ে

কীর্তন করতে করতে এলেন কাজীর কাছে। নিমাই-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে কাজী সেই আদেশ প্রত্যাহার করলেন। আবার নামগান চলতে লাগলো নবদ্বীপের পথে। এইবার নিমাই মনে মনে ঠিক করলেন যে তিনি সংসার ত্যাগ করবেন। গভীর রাত্রি। নগরে সবাই ঘুমে অচেতন। বাড়ীতে মা ও পত্নী ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ নিমাই ছেড়ে যাবেন তাঁর জন্মভূমি। তিনি ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে একবার তাকালেন। ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এলেন। পাশের ঘরে মা ঘুমিয়ে আছেন। মায়ের বদ্ধ দুয়ারে মাথা ঠেকিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নবদ্বীপে এবার তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁর সন্ধানে একদল ভক্ত বেরিয়ে গেল নবদ্বীপের বাইরে। এদিকে নিমাই কাটোয়ার পথে। মুখে তাঁর কৃষ্ণনাম। নিমাই কাটোয়ায় এসে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা নিলেন। তাঁর চাঁচর কেশ আর রইল না। পরলেন গেরুয়া—হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু। নাম হলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবার এলেন শান্তিপুরে। অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করছেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। মা শচীদেবী ছেলের সাথে দেখা করতে এলেন শান্তিপুরে। মায়ের অনুনয়েও তিনি ঘরে ফিরলেন না। দেশে দেশে হরিণাম প্রচার করতে চলে গেলেন। তখন লোকে পায়ে হেঁটেই তীর্থে যেত। শ্রীচৈতন্য এলেন পুরীধামে। পুরীধামের পণ্ডিতগণের নেতা বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম গ্রহণ করতে প্রথমে রাজী হননি। তর্কসভা বসল। বিচার চললো। চৈতন্যদেব জয়ী হলেন। পুরীধাম হরিনামে মেতে উঠলো। এবার চৈতন্যদেব চললেন দক্ষিণ দেশে।

সেখানেও নাম-প্রেমে মাতিয়ে ফিরে এলেন পুরীধামে। আবার গেলেন উত্তর-ভারত। সেখানেও হরি গুণগানে পাগল হলো সবাই। এমনি করে সমগ্র ভারতে তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন। আবার পুরীতে এলেন। তাঁর ধর্মের মূলকথা জীবে দয়া, হরিনাম কীর্তন আর বিনয়ী হওয়া। প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি তিনি তৃণ হতেও নীচ, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু, আর যার কোন মান নেই তাকেও সম্মান করেন।

পুরীতে বাস করতে লাগলেন শ্রীচৈতন্যদেব। প্রতিদিন মন্দিরের বিগ্রহের দিকে চেয়ে থাকেন অশ্রুসজল নেত্রে। শোনা যায় পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহে শ্রীচৈতন্যদেব বিলীন হয়ে গেলেন। সে যাই হোক তাঁর নামগান এই বিশ্বের বুক থেকে কোনদিন বিলীন হবার নয়। বাংলার ঘরে ঘরে আজো তাঁর প্রেমগান ধ্বনিত হচ্ছে।

"ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি
বিশ্বভূপের ছায়া
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।"

অনুশীলনী

১। নিমাই-এর বাল্যকালের কাহিনী লিখ।
২। প্রকৃত বৈষ্ণবের গুণগুলি কি কি ?
৩। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচার কাহিনী লিখ।

॥ বাংলার বাঘ আশুতোষ ॥

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে যারে পূজে সর্বজন।"



১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন কোলকাতা ভবানীপুরে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডাঃ গঙ্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। চক্রবেড়িয়ার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশুতোষ লেখাপড়া আরম্ভ করেন। গৃহশিক্ষকের কাছেও তিনি পড়তেন। পাঠশালার পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলে। তখন শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শৈশবকাল থেকে আশুতোষ ছিলেন খুব মেধাবী। সব সময় লেখাপড়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন। অত্যধিক পড়াশোনার চাপে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। রোজ অধিক রাত পর্যন্ত যাতে পড়াশোনা করতে না পারেন তার জন্য পিতা গঙ্গাপ্রসাদ

আশুতোষকে একবার একটা ঘরে বন্ধ করে রাখেন। সেই বন্ধ ঘর খোলা হোল। দেখা গেল আশুতোষ একটা কাঠকয়লা সংগ্রহ করে ঘরের দেওয়ালে ও মেঝেতে শুধু অংক করে রেখেছেন। শৈশব থেকেই অংক বিষয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় আশুতোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর গণিত-শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। সেবারেও প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারপর পেলেন 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি। বিলেতের কয়েকটি কাগজে আশুতোষের অংকশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। বিদেশে আশুতোষের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

আশুতোষ শুধু অংকশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন না। দর্শন, বিজ্ঞান, আইন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। 'ডক্টর অব ল' উপাধি পেয়েছিলেন আইন সম্বন্ধে গবেষণা করে। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে তিনি নির্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব-প্রকার উন্নতিবিধান করাই ছিল তাঁর ধ্যান। কর্মজীবনের আরম্ভ হতে শেষদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানাভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আশুতোষ পর পর আট বছর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও দানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ভবন, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা, পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ, মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ খোলা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাভাষায় এম. এ. পরীক্ষা

দেবার ব্যবস্থা তিনিই করেন। বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল।

আইন পাশ করে আশুতোষ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। সেখানেও তিনি আপন প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেন। কিছুদিন পরে হাইকোর্টের বিচারপতির আসন লাভ করেন। এই তেজস্বী দেশপ্রেমিকের জীবন সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একদিন স্যার আশুতোষ আলিগড় থেকে ট্রেনে আসছিলেন। পথে এক ষ্টেশনে উঠলেন এক সাহেব। ট্রেন চলছে। আশুতোষ ঘুমিয়ে পড়েছেন। ধুতি-চাদর পরা বাঙালীকে দেখে সাহেব তো রেগেই আগুন। সাহেব তখন রেগে আশুতোষের নূতন নাগরা জুতো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলো। কিছুক্ষণ পরে আশুতোষ জেগে উঠে দেখেন তাঁর জুতো নেই। আশুতোষ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনিও সাহেবের কোটটি নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। সাহেব তখন ঘুমিয়ে। ঘুম থেকে জেগে কোটটি দেখতে না পেয়ে সাহেব তা রেগে লাল। তখন আশুতোষ বললেন—"সাহেব তোমার কোট আমার জুতো আন্‌তে গেছে।" সাহেব তখন আর কি বলবে। এমন তেজস্বী নির্ভীক পুরুষ ছিলেন এই বাংলার বাঘ আশুতোষ। আশুতোষের মাতৃভক্তি ছিল প্রবল। একবার লর্ড কার্জন আশুতোষকে বিলেতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এতে আশুতোষের মায়ের অমত ছিল। মাতৃভক্ত আশুতোষ লর্ড কার্জনকে জানালেন তাঁর মায়ের অমতের কথা। লর্ড কার্জন লিখলেন—"আপনি আপনার মাকে জানিয়ে দিন যে ভারতের বড়লাট আপনাকে বিলেত যেতে আদেশ

করেছেন।" বাংলার বাঘ আশুতোষ জানালেন—"মায়ের আদেশই আমার বড় আদেশ। আমার বিলেত যাওয়া চলবে না।"

এই কর্মবীর, নির্ভীক দেশপ্রেমিক ১৯২৪-এর ২৫শে মে পরলোক গমন করেন।

"সেই আলো-শিখা আজো উজ্জ্বল
ঘুচে গেছে সব কালো।"

অনুশীলনী

১। আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কি কি করেছেন?
২। আশুতোষের জীবনে তেজস্বিতার একটি ঘটনা বর্ণনা কর।
৩। আশুতোষের মাতৃভক্তির পরিচয় দাও।

।। শহীদ ক্ষুদিরাম ।।

"স্বাধীনতা লাগি অকাতরে তুমি
দিয়ে গেলে নিজ প্রাণ !"



ফাঁসির মঞ্চের প্রথম শহীদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম। ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় ক্ষুদিরামের জন্ম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু নাড়াজোল রাজ-এষ্টেটের তহশীলদার ছিলেন। পর পর দুই ছেলের মৃত্যুর পর ক্ষুদিরামের জন্ম। এ ছেলেকেও যমে কেড়ে নেবে—এই ভয়ে এক মুঠো ক্ষুদ নিয়ে অপরের কাছে ছেলেকে বেচে দিলেন তাঁর মা। ক্ষুদের বদলে বেচে দিয়েছিলেন, তাই নাম রাখলেন ক্ষুদিরাম।

মা-বাবাকে হারালেন ক্ষুদিরাম ছেলেবেলাতেই। সেই থেকে তিনি মানুষ হতে থাকেন তাঁর দিদির কাছে। দিদির নাম অপরূপা দেবী। অপরূপার স্বামী অমৃতলাল তমলুকের দেওয়ানী আদালতে কাজ করতেন। গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে ক্ষুদিরাম ভর্তি হলেন হ্যামিলটন্ স্কুলে। অমৃতলাল বদলি হলেন মেদিনী-

পুরে। ক্ষুদিরামও তাঁর সঙ্গে গেলেন সেখানে। ভর্তি হলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ঐ স্কুলেরই শিক্ষক। বিপ্লবীদলের নেতা। সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামকে টেনে নিলেন ঐ দলের গুপ্তসভায়।

বিপ্লবী দলে যোগদান করে ক্ষুদিরাম লেখাপড়ার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। শুধু সমিতির কাজ আর অন্তরে উত্তেজনার আগুন। বিদেশী ইংরেজকে তাড়াতেই হবে। বিলেতী কাপড় পোড়াতে হবে—ক্ষুদিরাম দলনেতা। বিলেতী-নুন আর চিনির গাড়ী লুট করতে হবে—ক্ষুদিরাম দলনেতা। মেদিনীপুরে শিল্প-প্রদর্শনীতে পুস্তক বিতরণ করতে হবে—এই কাজের ভার নিলেন ক্ষুদিরাম। সেই বইগুলোতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা লেখা। হঠাৎ পুলিশ এসে যেই তাঁকে ধরতে এলো, পুলিশের নাকে এক ঘুঁসি মেরে ক্ষুদিরাম গেলেন পালিয়ে। তিনমাস পর ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম। সবাই ভাবলো এইবার বিপ্লবীদলের সবকর্মী ধরা পড়বে। পুলিশের দারুণ নির্যাতন সহ্য করলেন ক্ষুদিরাম। শুধু বললেন—আমি কিছু জানিনে।

সরকার তাঁকে ছেড়ে দিলেন—শুধু চিনে রাখলেন এই সত্যাশ্রয়ী বীরযুবককে।

এইবার এলো জীবনের চরম ডাক। স্বাধীনতার সংগ্রাম। ইংরেজ সরকার চাইলেন বাংলাকে দু'ভাগ করতে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগলো মেদিনীপুরে। সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বললো। তখনকার বাংলার তরুণ সম্প্রদায় বিবেকানন্দের বাণী ও ঋষি বংকিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" থেকে

প্রেরণা লাভ করেছিল। বিপ্লবীরা ভাবতেন ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতেই হবে। তাঁদের "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন।" সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন তাঁরা গোপনে। তৈরী হ'লো অনেক বোমা। বিদেশ থেকে এলো নানা অস্ত্র। এই মুক্তিসংগ্রামে ছিলেন ঋষি অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র চন্দ্র, হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বীর সন্তানগণ। এঁরা চির নমস্য।

ঘটনাচক্রে বিপ্লবীরা ধরা পড়লো। কারো হ'লো ফাঁসি, কারো দ্বীপান্তর। তখন কোলকাতায় কিংসফোর্ড ছিলেন চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। খুব অত্যাচারী শাসক। স্বদেশী আন্দোলনে "পিকেটিং" করে যে সব ছাত্র ধরা পড়ত, তাদের তিনি নির্মমভাবে বেত মারবার আদেশ দিতেন। একবার সুশীল সেন নামে ১৬ বছরের একটি ছেলে বেত্রাঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ফলে সারা ভারতে বিক্ষোভ ঘটে। ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে কিংসফোর্ডকে বদলি করেন মজঃফরপুরে। বিপ্লবীরা ঠিক করলেন কিংসফোর্ডকে সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে। তাঁকে হত্যা করবার দায়িত্ব নিলেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। ঠিক হ'লো রাতের অন্ধকারে কিংসফোর্ড যখন ক্লাব থেকে ফিটন গাড়ী করে বাংলোয় ফিরবেন তখন তাঁকে বোমার আঘাত করা হবে। ৩০শে এপ্রিল, রাত ৮টা। গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন ক্ষুদিরাম। তারপর প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পলাতক। অত্যাচারী কিংসফোর্ড কিন্তু মরলেন না। মরে গেলেন দু'জন মহিলা। পুলিশ তাদের পিছু নিল।

প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন, তবু ধরা দিলেন না। ক্ষুদিরাম এলেন পঁচিশ মাইল দূরে ওয়াইনী ষ্টেশনে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ। পিপাসার্ত ক্ষুদিরাম হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন।

বিচার শুরু হ'লো। হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হ'লো। ঘাতক ফাঁসির রশি পরাতে এলো। সেই রশি তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় পরলেন ক্ষুদিরাম। ফাঁসির মঞ্চে "বন্দেমাতরম্" শোনা গেল। হাসি মুখে শহীদ হ'লেন ক্ষুদিরাম। চির অমর হয়ে রইলেন তিনি। স্বাধীনতার প্রথম তোরণে ক্ষুদিরামের এই আত্মত্যাগই আমাদের স্বাধীনতা এনেছে। গ্রাম্য কবি ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে রচনা করেছেন গান :—

"একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে (মাগো)
চিনতে যদি না পার, চিনবে গলায় ফাঁসি।"

অনুশীলনী

১। ক্ষুদিরাম কাহার নিকট কিভাবে বিপ্লবের দীক্ষা লাভ করেন?
২। ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা কর।

।। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ।।

"নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে
নিখিল দানি'
মহাবীর কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগি,
প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী।"



নিখিল চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর কোলকাতায় জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতা ভুবন মোহন দাশ এটর্নি ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের আদি বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার তেলির-বাগ গ্রামে। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে যান বিলেতে সিভিল সার্ভিস পড়ার জন্যে। তখন বিলেতে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। সদস্য হবার জন্য প্রার্থী হ'লেন দাদাভাই নওরোজী। একজন ভারতীয়ের এই ইচ্ছার কথা শুনে ইংরেজরা ক্ষেপে গেল। নানা কুৎসা রটাতে লাগলো। তাঁকে হেয় করবার চেষ্টা চললো। লর্ড সলিসবেরী নওরোজীকে

বলে ফেললো 'কালা•আদমী'। তাছাড়া পার্লামেণ্টের একজন সদস্য বললো—বর্বর জাতির দেশ ভারতবর্ষ, আর ভারতবাসী হ'লো গোলামের জাত। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নরত চিত্তরঞ্জন সবকথা শুনলেন। তৎক্ষণাৎ বই ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। লণ্ডন শহরের বুকেই প্রতিবাদ সভা করলেন। তীব্রভাষায় পার্লামেণ্টের সদস্যটিকে আক্রমণ করলেন তার হীন মন্তব্যের জন্য। বাধ্য হ'লেন সেই ইংরেজ ভদ্রলোক তার কথা তুলে নিতে। ক্ষমা চাইলেন সকলের সামনে।

চিত্তরঞ্জনের এই তেজস্বিতার কথা লণ্ডনের সব কাগজে প্রকাশিত হ'লো। ইংরেজরা এই স্বাধীনচেতা যুবককে ম্যাজিষ্ট্রেটের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাতে রাজী হ'লো না। তারা চিত্তরঞ্জনের সিভিল সার্ভিস পড়ার অনুমতি কেড়ে নিলো। তারপর চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এলেন। কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করলেন।

আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আসামী। চিত্তরঞ্জন দাঁড়ালেন শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে। চিত্তরঞ্জনের সওয়ালের প্রভাবে অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন। এরপর থেকে দেশ-বিদেশে ছাড়িয়ে পড়লো ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের নাম। শোনা যায় প্রতিদিন তিনি প্রায় আড়াই হাজার টাকা রোজগার করতেন। চিত্তরঞ্জনের মন ছিল কুসুমের মত কোমল। একটি ঘটনা ……রাত নিঝুম। তাঁর বাড়ীতে হঠাৎ সোরগোল। একটা চোর ধরা পড়েছে। সবাই ধরে নিয়ে এলো তাকে চিত্তরঞ্জনের কাছে। তিনি বললেন—চুরি করতে এসেছ কেন? চোর কথা বললো না। কেঁদে ফেললো।

অমনি চিত্তরঞ্জনের অন্তর কেঁদে উঠলো। চোরটিকে নিজের বাড়ীতে কাজ দিলেন।

তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু।

একটি ঘটনা........চিত্তরঞ্জন একদিন কোর্টে যাচ্ছেন। এমন সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার কন্যাদায়ের কথা চিত্তরঞ্জনের কাছে নিবেদন করলেন। তিনি তাঁকে বিকেলে আসতে বললেন। ব্রাহ্মণ এলে তিনি তাঁকে সেদিনকার সমস্ত উপার্জন—হাজার টাকা দান করলেন। এমনি করে দেশের লোককে ভালবেসেই তিনি হ'লেন 'দেশবন্ধু'। অর্থ, যশ—কোনটারই তাঁর অভাব ছিল না। দেশের প্রতি ছিল তাঁর নির্মল ভালোবাসা। তিনি বলতেন—"দেশের কাজই আমার ধর্ম।" "স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার"—এই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র।

মহাত্মা গান্ধীর ডাকে তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে যোগ দিলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। অতুল যশ, অর্থ ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন পথে—জনতার মাঝে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের নেতা হয়ে উঠলেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও চিত্তরঞ্জনের দান আছে। তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। "নারায়ণ" নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

দেশবন্ধুই সর্বপ্রথম কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। দয়ার প্রতিমূর্তি চিত্তরঞ্জন বহু বিপন্ন পরিবারকে অর্থ সাহায্য করতেন। দানবীর চিত্তরঞ্জন তাঁর কোলকাতার বাড়ীটাও জাতির সেবায় দান করে গেছেন। সেটা আজ 'চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন।'

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক ও কর্মী দেশবন্ধু দার্জিলিং-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরম আত্মীয়কে হারালে মানুষ যেমন কাঁদে—দেশবাসীও তেমনি কেঁদেছিল দেশবন্ধুকে হারিয়ে। এই প্রাণ মৃত্যুহীন।

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

অনুশীলনী

১। চিত্তরঞ্জনকে "দেশবন্ধু" বলা হয় কেন?

২। "দেশবন্ধুর মন ছিল কুসুমের মত কোমল"—কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

॥ বিধান চন্দ্র রায় ॥

নূতন বাংলার স্রষ্টা বিধান চন্দ্র রায় ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রকাশ চন্দ্র রায় এবং মায়ের নাম অঘোরকামিনী দেবী। ছাত্রাবস্থায় তিনি সাধারণভাবে চলতেন এবং সাধারণ ছেলের মতোই লেখাপড়া করতেন। বি. এ. পাশ করে মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল. এম. এস্. পাস করেন বিধান চন্দ্র। মেডিক্যাল কলেজে হাউস-ফিজিসিয়ান পদে ডাঃ রায় দুই বৎসর কাজ করেন। কাজ করতে করতে তিনি এম, ডি, উপাধি লাভ করেন। তারপর বিধান চন্দ্র বিলেত থেকে এম. আর. সি. পি. ও এফ আর সি. এস. পাস করে চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করেন। তিনি টাকার জন্য কোন দিন পীড়াপীড়ি করেন নি। সময় সময় এমনও হয়েছে যে রোগীর আর্থিক অবস্থা দেখে তিনি ফি তো নেননি, উপরন্তু নিজের পকেট থেকে ঔষধ ও পথ্য কিনে দিয়েছেন তাদের। খুব কম সময়ের মধ্যেই বিধান রায়ের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।



মেডিক্যাল কলেজে যোগদানের পর তিনি স্যার আশুতোষের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ফেলো পদে নির্বাচন-

প্রার্থী ও নির্বাচিত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাড়ীর সামনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর ডাঃ রায় আইনসভার নির্বাচনে ঃব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৩১—৩২ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবক্রমে কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী হন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের যে কয়জন মুখ্যমন্ত্রী সর্ব ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁদের একজন। শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও সততা সর্বজনস্বীকৃত।

দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা, কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জনে রেলের কারখানা এবং হরিণঘাটায় দুগ্ধপল্লী এই সমস্ত তিনি গড়ে তোলেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই এই কর্মবীর জন্মদিনে পরলোকগমন করেন।

অনুশীলনী

১। বিধান চন্দ্র রায়ের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

২। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য তিনি কি কি করেছিলেন ?

॥ হিংসার পরাজয় ॥

"সত্য চিরকালই এক ; মিথ্যার অগণিত রূপ ;"

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত। তাঁর ছিল প্রচুর ধনদৌলত। কিন্তু লোকে প্রশংসা করে দীর্ঘোতির। কোশলের রাজা ছিলেন দীর্ঘোতি। রাজ্য তাঁর ছোট ছিল, কিন্তু হৃদয় ছিল বড়। যুদ্ধ-বিগ্রহ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি শুধু বলতেন—"হিংসার জয় নেই।" ব্রহ্মদত্ত তাঁর চরের মুখে দীর্ঘোতির প্রশংসা শুনলেন। হিংসায় জ্বলে উঠলেন তিনি। ব্রহ্মদত্ত আদেশ দিলেন তাঁর সৈন্যদের—"কোশল আক্রমণ কর। দীর্ঘোতি আর তাঁর রাণীকে বেঁধে নিয়ে এসো।" যুদ্ধে কোশলরাজ পরাজিত হলেন। রাণীর হাত ধরে পালিয়ে গেলেন রাজা দীর্ঘোতি। বহুদেশ ঘুরে এসে পৌঁছুলেন কাশী রাজ্যে। এক বৃদ্ধ কুম্ভকারের ঘরে আশ্রয় নিলেন। রাজা ও রাণীকে পেয়ে কুম্ভকার খুব খুশী হ'লো। কুম্ভকারের গৃহেই দীর্ঘোতির এক সন্তান হ'লো। কুম্ভকারই ছেলেকে কোলে পিঠে করে রাখে। ছেলের নাম রাখা হ'লো দীর্ঘায়ু। ধীরে ধীরে দীর্ঘায়ু বড় হয়ে ওঠে। দীর্ঘায়ু রূপবান। রাজা-রাণীর শুধু ভয়—ব্রহ্মদত্ত যদি দীর্ঘায়ুর সন্ধান পায়। রাজা-রাণী তাকে দূর দেশে পাঠিয়ে দিতেই মনস্থির করলেন। বিদায়ের পূর্বে দীর্ঘোতি ছেলেকে বললেন—"একটা কথা জীবনে কখনো ভুলো না—হিংসা কখনো জয়ী হয় না।" এদিকে দীর্ঘোতি আর

তাঁর রাণীর কথা কাশীরাজের কানে গেল। শেষকালে তাঁদের জন্য তাঁর রাজ্য নষ্ট হবে নাকি! তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রহ্মদত্তের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন। ব্রহ্মদত্তের সৈন্যেরা দীর্ঘোতি ও রাণীকে বেঁধে নিয়ে গেল বারাণসীতে। শৃঙ্খলাবদ্ধ দীর্ঘোতি বললেন—"হিংসার জয় নেই"। রাজসভার লোকের হাসিতে দীর্ঘোতির কণ্ঠ ডুবে গেল। দীর্ঘোতি আবার বললেন—"রাজা ব্রহ্মদত্ত! আমি মিথ্যা বলিনি। হিংসার পরাজয় হবেই।" ব্রহ্মদত্ত বললেন —"তোমার অহংকার আমি চূর্ণ করব, দীর্ঘোতি। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।" আজ রাজা ও রাণীর প্রাণদণ্ড হবে। রাজা চলেছেন বধ্যভূমির দিকে। পিছনে রাণী। তাঁদের মুখে চোখে প্রশান্তি। বারাণসীর সাধারণ মানুষের এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার সাহস নেই ব্রহ্মদত্তের ভয়ে। জনতার মধ্যে দীর্ঘায়ুর বিষণ্ণ চোখের উপর চোখ পড়তেই রাজার মনটা হাহাকর করে উঠল। তাকে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন। ব্রহ্মদত্তের ভয়ে পারেন নি।

পুত্রের নিকট দিয়ে যাবার সময় রাজা ও রাণী শেষ কথা উচ্চারণ করলেন—"হিংসার জয় নেই।"

মা, বাবা দীর্ঘায়ুকে ছাড়িয়ে চলে গেলেন। দীর্ঘায়ুর চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

তারপর কত বৎসর কেটে গেল। একদিন বারাণসীতে এলো এক অজ্ঞাত যুবক। সে রাজা ব্রহ্মদত্তের হাতীশালায় চাকরি নিলো। বড় চমৎকার বাঁশী বাজাতেও সে পারে। বনের জন্তু

জানোয়ারও তার বাঁশী শুনে থমকে দাঁড়ায়। পাগলা হাতী পর্যন্ত পা তুলে নাচে। যে পাগলা হাতীটাকে দেখে সবাই ভয় পায়, সে-ও তাকে দেখলে খুশীতে শুঁড় নাড়ে। একদিন রাজার খেয়াল হ'লো তিনি শিকারে যাবেন। ঐ পাগলা হাতীটারই পিঠে চেপে। ঐ যুবক ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই তাকে বাগ মানায়? রাজার সাথে তাকেও যেতে হ'লো। পাগলা হাতীটা যুবক আর রাজাকে পিঠে নিয়ে গভীর বনে চলে গেল। রাজা হেঁকে বললেন—হাতী থামাও। আমি বিশ্রাম নেব। হাতী থেকে নেমে যুবকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন রাজা। ঘুমিয়ে পড়লেন তখনই। চারিদিক নির্জন। এই সুযোগ। হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো যুবকের মনে। খুনের বদলে খুন। মাতাপিতার হত্যাকারীকে চরম শাস্তি দেবে। তরবারি মুক্ত করলো সে। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো অতীতের এক ছবি। বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে চলেছেন রাজা দীর্ঘোতি ও রাণী। তাঁদের মুখে শান্তির বাণী—"হিংসার জয় নেই।" অমনি তরবারি খসে পড়লো যুবকের হাত থেকে। রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যুবককে তিনি জড়িয়ে ধরে বললেন—"একটা স্বপ্ন দেখলাম। তুমি যেন আমায় হত্যা করতে আসছ। তখনই কে যেন বললে—হিংসার জয় নেই। আর তোমার হাত থেকে অমনি খসে পড়লো তরবারি। আমারও ঘুম গেল ভেঙ্গে।" যুবক বললো—"মিথ্যে নয় রাজা। আমিই আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। আমার বাবা-মায়ের কথা তখন মনে পড়লো। তাঁরা বলেছিলেন—হিংসার জয় নেই।" রাজা বললেন—"আমি

সব বুঝেছি, যুবক। একথা যদি আগে বুঝতাম তাহ'লে ছুটো মহাপ্রাণ নিহত হ'তো না।"

দীর্ঘায়ু তখন অশ্রু বিসর্জন করছে আর বলছে—"মহারাজ, আমি তাঁদেরই সন্তান দীর্ঘায়ু।"

রাজার চোখেও এলো জল। গভীর স্নেহে তিনি যুবককে বুকে টেনে নিলেন।

অনুশীলনী

১। মৃত্যুর পূর্বে রাজা রাণী পুত্রকে কি বলেছিলেন?

২। কি ভাবে হিংসার পরাজয় ঘটলো?

॥ আমরা বাঙ্গালী ॥

"আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই
বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে"

আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গভূমিই আমাদের বাঞ্ছিত ভূমি। এখানে ঠিক কবে থেকে মানুষের বসতি শুরু হয়েছে তা স্থির করা কঠিন। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পড়লে জানা যায়। 'প্রত্নপ্রস্তর যুগে' তারা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত। পরবর্তী যুগ 'নব্য-প্রস্তর যুগ।' তখন মানুষের সভ্যতা একটু উন্নত হয়েছে। মানুষ তখন আগুন জ্বালাতে শিখেছে। রান্না করতে শিখেছে। তারপর এলো 'তাম্রযুগ'। তামার অস্ত্র ব্যবহার করতো মানুষ। এ উন্নততর সভ্যতার চিহ্ন। এমনি করে এদেশেও মানব সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে। এদেশেও প্রত্নযুগ, নব্যপ্রস্তরযুগ আর তাম্রযুগের অস্ত্র পাওয়া গেছে। তা থেকে এদেশের সভ্যতা ও প্রাচীনতা বোঝা যায়। নৃতত্ত্ববিদ্ যাঁরা, তাঁরা মনে করেন বাঙ্গালী জাতির মধ্যে চারটি মূল জাতির উপাদান আছে।

(এক) লম্বা মাথাওয়ালা একটি জাতি। এরা আর্য। সংখ্যায় অল্প।

(দুই) নীচু মাথাওয়ালা জাতি। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ও কোল জাতীয় লোক এরা। এদেশের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এরকম লোক কিছু দেখা যায়।

(তিন) গোল মাথাওয়ালা জাতি। এদেশে এই শ্রেণীর লোকই বেশী। বাঙ্গালীদের: মাথা সাধারণতঃ গোল। ভারতের বাইরেও এরকম গোলমাথাওয়ালা লোক দেখা যায়।

(চার) উত্তর ও পূর্ববাংলায় কিছু লোক দেখা যায় যাদের নাক চেপ্টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফ দাড়ি কম। এরা মোঙ্গল জাতীয়।

নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন এই চার রকম জাতির মিশ্রণে এই বাঙ্গালী জাতি গড়ে উঠেছে। বাংলা ভাষাকে বিশ্লেষণ করে ভাষাবিদ্‌গণ বলেছেন যে আর্যরা এদেশে আসবার আগে এখানে নানা জাতির লোক বাস করত। তখন বাঙ্গালীরা অনার্য ভাষায় কথা বলত। তখন এদেশে দ্রাবিড়, কোল, ভোট-চীনা প্রভৃতি ভাষা ব্যবহৃত হত। এগুলো অনার্য জাতির ভাষা। আজ আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে কোল, শবর, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অনেক জাতি বাস করছে। এরাই বাংলার আদিম অধিবাসী। অত্যন্ত প্রাচীন কালে আমাদের দেশে গ্রামে বাস করত নিষাদ জাতি। চাষবাস করত তারা। ক্রমে ক্রমে তামা ও লোহার ব্যবহার শিখেছিল। তারা ধান, পান, কলা, নারকেল, সুপারি প্রভৃতির চাষ করত, মুরগি পুষতো।

বেদ থেকে আমরা জেনেছি আর্য ও অনার্য জাতির কথা। আর্যরা ভারতে এলো বেদের মন্ত্র নিয়ে। ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে। অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের সংঘাত হলো। জয়ী হলো আর্যরা। অনার্যরা আর্যদের ভাষা ও ধর্ম মেনে নিল।

অনার্যদের ভাষা ও ধর্মের প্রভাবও পড়লো আর্যদের উপর তারপর আর্যরা ছড়িয়ে পড়লো উত্তর ভারতে বিহার পর্যন্ত। এলো উপনিষদের যুগ। বুদ্ধদেব—মহাবীরের যুগ পরপর অতিক্রান্ত হ'লো। তখনো বাংলাদেশে আসেনি আর্যরা। অনার্যদেশ বলে বাংলার প্রতি উত্তর ভারতের আর্যরা বিরূপ ছিল।

ধীরে ধীরে আর্যরা আসেন মগধে। কালে কালে মৌর্যরা বাংলা দেশ জয় করে। মগধের ব্রাহ্মণ ও সাধারণ মানুষ বাংলায় এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। এদেশে তখন আর্য ভাষা প্রচারিত হ'তে লাগলো। বাংলার অনার্যরা আর্যদের সংগে মিশে গেল। ধীরে ধীরে বাঙ্গালী বলে একটা বিশিষ্ট জাতি গড়ে ওঠে। আসল কথা কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল প্রভৃতি অনার্য জাতির সঙ্গে মিশে গেল আর্যভাষা, আর্য সভ্যতা, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম—আর তা থেকে আমাদের পূর্বপুরুষ এই বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হ'লো। নানা জাতির মিশ্রণে গড়ে উঠলেও বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী। তাঁর ভাষাও প্রাণময়ী।

"ঐ ভাষাতেই বলব হরি
সাঙ্গ বলে কাঁদা হাসা।"

অনুশীলনী

১। বাঙালী জাতির মধ্যে কোন্ কোন্ জাতির উপাদান আছে?
২। বাঙালী জাতির উদ্ভবের ইতিহাস লিখ।



সার্থক জনম আমার
(আমি) জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালোবেসে ॥
জানিনে তোর ধন-রতন
আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন, শেষে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—ঃ সমাপ্ত ঃ—